দাম : ষোলো টাকা

# স্বস্তিকা

৭৮ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা।। ২০ এপ্রিল, ২০২৬
৬ বৈশাখ, ১৪৩৩।। যুগাব্দ - ৫১২৮
website : www.eswastika.com

## অক্ষয় তৃতীয়া

অক্ষয় পুণ্যলাভের তিথি

# কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

# স্বস্তিকা

*।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।*

৭৮ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা, ৬ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

২০ এপ্রিল - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

**সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা**

**সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল**

**প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

দূরভাষ :

**সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)**

**সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫**

**সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪**

**বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩**

**দাম : ১৬ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।**

**Postal Registration No.**- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।


# সূচীপত্র


সম্পাদকীয় □ ৫

**ভোট সমীক্ষায় বিজেপি-র বিশাল উত্থান আর তৃণমূলের পতন কি পরিবর্তনের ইঙ্গিত? যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়** □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

**নতুন বছরের কান্না-হাসি** □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

**সঙ্ঘের পঞ্চ পরিবর্তন কর্মসূচি ভারতীয়ত্ব প্রতিষ্ঠারই সংকল্প** □ ডঃ মনমোহন বৈদ্য □ ৮

**কালিয়াচকে বিচারপতিদের ওপর জেহাদি তাণ্ডবে নির্বাচন কমিশন ও বিচারব্যবস্থা চুপ কেন?** □ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ১১

**রক্তাক্ত স্মৃতি থেকে পুনর্জীবন—কাশ্মীরের মন্দির ও মানবিক প্রত্যাবর্তন** □ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী □ ১৩

**পৃথিবী পালটে দেওয়া একটি 'গোপন বক্তৃতা'** □ পিন্টু সান্যাল □ ১৫

**রাজ্য বিধান সভা নির্বাচনে নৈরাজ্যের অবসান কাম্য** □ বিশ্বপ্রিয় দাস □ ১৮

**অক্ষয় পুণ্য লাভের তিথি অক্ষয় তৃতীয়া** □ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ২৩

**হিন্দুত্বের মূল্যবোধে অক্ষয় তৃতীয়া উদ্‌যাপন** □ প্রদীপ মারিক □ ৩১

**বাঙ্গালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য শশাঙ্ক থেকে বর্তমান** □ প্রবীর ভট্টাচার্য □ ৩৩

**অক্ষয় পুণ্যলাভের লক্ষ্যে অক্ষয় তৃতীয়ার মাহাত্ম্য উপলব্ধি গুরুত্বপূর্ণ** □ গোপাল চক্রবর্তী □ ৩৫

**বাম ও ইসলামি কট্টরপন্থা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ** □ অমিত কুমার চৌধুরী □ ৩৬

**বাঙ্গালিয়ানা কাম্য কিন্তু ভারতীয়ত্বকে অস্বীকার করে নয়** □ সৌম্য চক্রবর্তী □ ৩৯

**আজাদ হিন্দ সরকার গঠন ও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে শেষ মোক্ষম লড়াই** □ প্রণব দত্ত মজুমদার □ ৪৩

**হিন্দুস্থানে হিন্দুরাই সংখ্যালঘু হওয়ার পথে** □ অজয় ভট্টাচার্য □ ৪৭

**একটা ছোটো ভুল আবার বাঙ্গালিকে দেশভাগের মতো অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করবে না তো?** □ কৌটিল্য □ ৪৮

**গল্প কথায় ডাক্তারজী** □ সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস □ ৫০

**নিয়মিত বিভাগ :**

**□ চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৭-৩০ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন □ ৪৯**

প্রকাশিত হবে
২৭ এপ্রিল
২০২৬

# স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৭ এপ্রিল
২০২৬

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

## বিধানসভা নির্বাচন - ২০২৬

এরাজ্যে ভোটের দামামা বেজে উঠতেই বিভিন্ন জেলায় প্রধান বিরোধী দলের প্রার্থী, সমর্থক ও কর্মীদের ওপর শাসক দলের আক্রমণ নেমে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী ও তার ভাইপো ভয়ঙ্কর কায়দায় বিরোধী দলের কর্মীদের হুমকি দিচ্ছেন ও জেহাদিদের উসকানি দিচ্ছেন। রাজ্যকে যখন বিরোধীশূন্য করার চরম অগণতান্ত্রিক খেলা খেলছে শাসক দল, তখন বিরোধী ভোট বিভাজনের লক্ষ্যে নেমেছে বামপন্থীরা। এমতাবস্থায় নিরাপদে নির্বাচন করাতে রাজ্যবাসীর ভরসা হলো নির্বাচন কমিশন ও সুপ্রিম কোর্ট।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করবেন কয়েকজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
**SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
**INDIAN OVERSEAS BANK**

Branch : **Sreemani Market**
**Kolkata-700 006**

## বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০্) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

## একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

**সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—**

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

# সম্পাদকীয়

## মানব কল্যাণের এক শুভ মুহূর্ত

ভারতীয় সংস্কৃতিতে উৎসব অনুষ্ঠান নিছক আনন্দ স্ফূর্তির জন্য নহে, তাহার এক গভীর তাৎপর্য রহিয়াছে। প্রতিটি অনুষ্ঠান, পালাপার্বণে সেই তাৎপর্য অনুধাবন করিয়া ভারতবাসী আত্মশক্তিতে ভরপুর হইয়া ওঠে। এই আত্মশক্তিতে সমৃদ্ধ হইয়াই একদা ভারতবর্ষ বিশ্বের অগ্রগণ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষের নিকট উন্নত চরিত্র ও আচরণের শিক্ষা গ্রহণ করিতে একসময় ভারতীয় ঋষিগণ বিশ্ববাসীকে উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছিলেন। ভারতবাসী হৃদয়ের শুদ্ধতায় উৎসব অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করিয়াই অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স দুই-ই করায়ত্ত করিয়াছিল। ভারতবর্ষ তথা বাঙ্গালি সম্বৎসরের উৎসব উদ্‌যাপনে শুধুমাত্র আনন্দের জোয়ারে গা না ভাসাইয়া তাহার মর্ম অনুধাবন করিয়া নিজেকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। বাঙ্গালি তাহার জাতির আত্মপরিচয়ের দিন বঙ্গাব্দ উদ্‌যাপন করিতে না করিতেই আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ তিথি আসিয়া পড়ে। ভারতীয় পরিভাষায় তাহা অক্ষয় তৃতীয়া নামে পরিচিত। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতিথিতে উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে বলিয়াই ইহা অক্ষয়তৃতীয়া নামে অভিহিত। এত গৌরবময় ঐতিহ্যে পরিপূর্ণ তিথি ভারতীয় সংস্কৃতিতে কয়েকটি মাত্র রহিয়াছে। ইহা কোনো প্রাদেশিক উদ্‌যাপন নহে, সমগ্র ভারত জুড়িয়া ইহার ব্যাপ্তি। জ্যোতিষশাস্ত্রানুযায়ী এই তিথিতে সূর্য ও চন্দ্র সর্বোচ্চ উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয় বলিয়া সমস্ত শুভকর্ম সাফল্য প্রদান করিয়া থাকে। এই তিথিতেই সত্যযুগের সমাপ্তি হইয়া ত্রেতাযুগের শুভারম্ভ হইয়াছে। ত্রেতাযুগ সত্য, ন্যায় ও পবিত্রতার যুগ নামে পরিচিত। এই যুগেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব এবং তাঁহার রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠা। এই পুণ্যতিথিতেই ভগীরথের কঠোর তপস্যায় মা গঙ্গা মর্ত্যভূমিতে অবতরণ করিয়াছেন। এই তিথিতেই ভগবান বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরামের আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি শুধু একজন যোদ্ধাই ছিলেন না, ধর্মরক্ষকও ছিলেন। এই তিথিতেই সিদ্ধিদাতা শ্রীগণেশের সহায়তায় মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত রচনা শুরু করিয়াছিলেন। এই দিনেই সূর্যদেবতা জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরকে অক্ষয়পাত্র দান করিয়াছিলেন, যাহার দ্বারা বনবাসকালে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী ঋষি দুর্বাসার ক্রোধ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই দিনেই কুবেরের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব শিবশঙ্কর তাহাকে অতুল ঐশ্বর্য দান করিয়াছিলেন। ক্ষীরসমুদ্র মন্থনের ফলে এই দিনেই মা লক্ষ্মীর আগমন ঘটিয়াছিল, তাই এই দিনেই বৈভব লক্ষ্মীর পূজা করিবার রীতি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই দিনেই দ্রৌপদীকে অক্ষয় বস্ত্র দান করিয়া তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন। এই দিনের অভিজিৎ মুহূর্তে পুরীর জগন্নাথদেবের রথ নির্মাণকার্যও আরম্ভ হইয়া থাকে। এই তিথি বৌদ্ধ ও জৈন সমাজেও গুরুত্বের সহিত উদ্‌যাপন করা হইয়া থাকে। বৌদ্ধগণ এই দিনে অখণ্ড উপাসনায় মগ্ন থাকেন। জৈন ঐতিহ্য অনুসারে এইদিন প্রথম তীর্থঙ্কর ভগবান ঋষভদেব রাজা শ্রেয়াংসের হস্ত হইতে ইক্ষুরস পান করিয়া তাঁহার দীর্ঘ উপবাস হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন । তাহার স্মরণে এইদিন জৈনগণ মন্দিরে মন্দিরে বিশেষ পূজার আয়োজন করিয়া থাকেন এবং পথচলতি মানুষকে ইক্ষুরস পান করাইয়া থাকেন।

অক্ষয় তৃতীয়া যে এত তাৎপর্যময় ঘটনার সমাহার তাহা ভাবিয়া অবাক হইতে হয়। প্রতিটি তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহা উদ্‌যাপন করিতে করিতে ভারতবাসী আত্মসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াছে। বস্তুত, এই তিথি আধ্যাত্মিক জাগরণের পর্ব। ইহার কারণেই এই অনুষ্ঠানের দেশব্যাপী উদ্‌যাপন। এই দিন মানবতার কল্যাণে যাহা কিছু সম্পন্ন করা হয়, তাহার পুণ্য অক্ষয়রূপে মানবজীবনকে আলোকিত করিয়া থাকে। এই দিনে শুদ্ধ হৃদয়ে যাহা কিছুর সূচনা করা হয় তাহারই শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতে থাকে। বহু ব্যবসায়ী এই পুণ্য তিথিতে হালখাতার শুভারম্ভ করিয়া থাকেন। এদিনকে নূতন শুরুর দিন বলিয়াও মনে করা হইয়া থাকে। যাঁহারা শুদ্ধ মনে যাহা কিছুর সূত্রপাত করিয়া থাকেন তাহার ফল সুদূরপ্রসারী হইয়া থাকে। ব্যবসায়ীগণ যেরূপ নূতন উদ্যোগ আরম্ভ করিয়া থাকেন, সেইরূপ কৃষকগণও এদিন প্রথম ভূমিকর্ষণের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বর্তমান সময়ে অক্ষয় তৃতীয়ার উদ্‌যাপন কিছুটা হইলেও রূপান্তর ঘটিয়াছে। এই দিন উপলক্ষ্যে দোকানে দোকানে স্বর্ণ বা রৌপ্য ক্রয় করিবার ধুম পড়িয়া যায়। বিশ্বাস, তাহার ফলে ক্রেতাসকল ভবিষ্যতে লাভবান হইবেন। আসলে, এই তিথিতে কোনো সদ্ ব্যক্তি অথবা কোনো জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে স্বর্ণ অথবা রৌপ্য দান করিয়া পুণ্য সঞ্চয়ের দিন। মনে আনন্দ, শান্তি ও পবিত্রতা আনয়ন করিবার দিন। এই দিনে শুদ্ধ মনে, নিঃস্বার্থ বুদ্ধিতে দান-ধ্যান ও পূজার ফল অক্ষয় হইয়া থাকে। অক্ষয় তৃতীয়া একটি বহুমুখী উদ্‌যাপনের তিথি। এদিন শুভ কর্মের কারণে মন অধ্যাত্মমুখী, উন্নত, পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে এবং বস্তুগত সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধিও ঘটিয়া থাকে। এদিন কাহারও প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করিলে ঈশ্বরও তাহাকে আজীবন পুণ্যফল প্রদান করিবেন— এইরকম বিশ্বাস রহিয়াছে। এটি শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নহে, মানব কল্যাণের এক শুভ মুহূর্তও বটে।

### সুভাষিতম্

**স হি ভবতি দরিদ্রো যস্য তৃষ্ণা বিশালা।**
**মনসি চ পরিতুষ্টে কোঽর্থবান্ কো দরিদ্রাঃ।।**

অর্থঃ যার কামনা-বাসনা বিশাল সেই-ই প্রকৃত অর্থে দরিদ্র। যার মানসিক সন্তুষ্টি রয়েছে, তার কাছে কে ধনী আর কে নির্ধন?

## ভোট সমীক্ষায় বিজেপি-র বিশাল উত্থান আর তৃণমূলের পতন কি পরিবর্তনের ইঙ্গিত?

# যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়

**নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়**

তৃণমূলের পদলেহী এক বুদ্ধিজীবী বললেন বিজেপি ক্ষমতায় এলে তাঁর ওপর আক্রমণ হতে পারে কি না? ২০২১-এর ভোটের পর বিজেপি কর্মীদের ওপর টানা ১২ দিন ধরে তাণ্ডব চলে। তার বিচার হয়নি। ভাবতে অবাক লাগে একটি রাজনৈতিক দল কতটা অরাজনৈতিক আর অবিবেচক হলে মিথ্যার দাঁড়িপাল্লা ধরে শাসন মাপে । তাদের দু'টি শিরঃপীড়া হলো—'এসআইআর' ও শাসক বিরোধী ভোট বা 'অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি'। বিজেপি তার ঘাড়ে বিদায় নিঃশ্বাস ফেলছে। প্রায় সব নির্বাচনী সমীক্ষাই বিজেপি-র বিশাল উত্থান আর তৃণমূল কংগ্রেসের পতন দেখাচ্ছে। তা সত্য হলে সহজেই বলা চলে যে, এই উত্থানই পরিবর্তনের ইঙ্গিত। ২১৫ আসন থেকে তৃণমূল নামছে ১৫৯-এ আর ৭৭ থেকে বিজেপি উঠছে ১৫০-তে। দলীয় কর্মীদের মনোবল বাড়াতে তৃণমূল দাবি করছে তারা ২৫০ পার হবে আর বিজেপির দাবি— 'পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার'। প্রায় ৯২ লক্ষ বাদ পড়া ভোটারের মধ্যে ৬৪ শতাংশ ভূতুড়ে ভোটার। ৩৬ শতাংশ জাল ভোটার। সিপিএম-এর মতো এই জল ভোটেই জেতে তৃণমূল। এই দু'টি রাজনৈতিক দল হলো মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ।

২০২১-এর ভোটে রাজ্যে ১১২টি মুসলমান অধ্যুষিত আসনের ভিতরে তৃণমূল কংগ্রেস পায় ১০৬টি আসন। সেই গড়ে ইতিমধ্যেই ফাটল ধরেছে। মুসলমানদের ৩০ শতাংশ ভোট হাতে নিয়ে নির্বাচন জিততো তৃণমূল। সে গুড়ে বালি পড়েছে। ২০২১-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের সময় রাজ্যে ৭ কোটি ৩৪ লক্ষ ভোটার ছিল। এবারে তা নেমে ৬ কোটি ৭৫ লক্ষ হয়েছে। কালিয়াচকের মোথাবাড়ির ঘটনায় রাজ্যের মাথা হেঁট হলেও মুখ্যমন্ত্রীর হয়নি। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আর নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা মিলে নিশ্চিত করেছেন যে, এ রাজ্যে প্রায় ১২ শতাংশ ভুয়ো ভোটার রয়েছে। ২০২৫-এর ভোটার তালিকায় থাকা আনুমানিক ৭.৬৬ কোটি ভোটারের মধ্যে থেকে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার প্রায় ৯২ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। যারা বাদ পড়েছেন, পুরোমাত্রায় নতুন করে ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে তাদের ফিরে আসার বড়ো কোনো সুযোগ নেই বললেই চলে। তাই সুপ্রিম আদালত জানিয়ে দিয়েছে যে, একবার ভোট দিতে না পারার অর্থ চিরকালের জন্য ভোটাধিকার চলে যাওয়া নয়। ভোটমুখী বাকি তিন রাজ্যে ইতিমধ্যেই ১২-১৪ শতাংশ ভোটারের নাম সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির ভোটার তালিকার বিশেষ, নিবিড় সংশোধনীতে বাদ পড়েছে। কিছু প্রাক-নির্বাচনী সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছে যে, এবারের পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটে অসমে বিজেপি ক্ষমতায় ফিরছে আর এআইএডিএমকে-কে সঙ্গে নিয়ে তারা তামিলনাড়ুতে সরকার গঠন করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের পনেরো বছরের তৃণমূল সরকারকে সরাতে তারা অনেকটাই এগিয়েছে। শেষ রক্ষা হয় কি না সেটাই দেখার। এই মুহূর্তে বিজেপি এককভাবে এবং জোট করে ভারতের ২১টি রাজ্যে ক্ষমতাসীন। পশ্চিমবঙ্গ আর তামিলনাড়ুতে ক্ষমতায় এলে এক দেশ-এক জাতি-এক ভাবনার কাজ আরও এগাবে। জাতি গঠন ও দেশ নির্মাণে তা সহায়ক হবে। সনাতন হিন্দুধর্মকে হিন্দুরাই রক্ষা করেন, তার প্রভাব প্রচার আর বিকাশ ঘটান। হিন্দুধর্মের বাস্তব রূপ কিন্তু বিশ্বজনীন। তা হলো মানব ধর্ম। এ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের 'এক দেশ-এক ভোট'-এর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। যেমন অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির পুনর্নির্মাণ আর কাশ্মীরের অস্থায়ী ৩৭০ ধারা বাতিলের কাজ তারা শেষ করেছে। সরকারি ফাইল আর ভোটার ফর্ম চুরিতে ইতিমধ্যেই হাত পাকিয়ে ফেলেছে এ রাজ্যের শাসক পরিবার। অন্যায় ঢাকতে তাদের করা বেশিরভাগ মামলায় তারা হেরে গিয়েছে। নারকীয় অভয়াকাণ্ড চাপা দিতে উকিলদের জন্য তারা কত টাকা খরচ করতে নির্দেশ দিয়েছিল সেই লুকোনো সরকারি নোট প্রকাশ্যে এসেছে। যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক অস্বস্তি থেকে পালিয়ে যাওয়া তৃণমূলনেত্রীর কাছে নতুন নয়। ১৯৮৯ আর ২০২১ দু'বার হেরে সেই কেন্দ্র ছেড়ে তিনি পালান। ২০২১-এ উপনির্বাচনে জিতে মুখ্যমন্ত্রী হন। এ নজির ভারতের রাজ্য আইনসভার রাজনীতিতে বিরল। তবে বুঝতে পারেননি যে ভবানীপুর থেকে পালানো যাবে না। তাই খানিকটা বাধ্য হয়েই ভোটের ময়দানে নামতে হয়েছে। অবাক কাণ্ড হলো— নিজের 'কলকাতা বন্দর' বিধানসভা কেন্দ্র ছেড়ে নেত্রীর হয়ে ভবানীপুর কেন্দ্রে প্রচার চালাচ্ছেন ফিরহাদ হাকিম। মহাভারতে শকুনিকে প্রতিনিধি রেখে বেআইনি পাশা খেলায় পাণ্ডবদের হারিয়েছিল দুর্যোধন। হাস্যকরভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন যে, তিনি পাণ্ডববংশ। কিন্তু কাজ করছেন ঠিক উল্টো! ১৩ থেকে ১৫ এপ্রিলের মধ্যে আইপ্যাক মামলার নিষ্পত্তি হলে আর তৃণমূলনেত্রীর যথাযোগ্য শাস্তি হলে রাজ্যে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ভোটাররা আশ্বস্ত হবেন। রাজ্যের ভোটচিত্র আরও খানিকটা পাল্টাবে। পরিবর্তনের ইঙ্গিত আরো স্পষ্ট হবে।

**(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)**

# নতুন বছরের কান্না-হাসি

ঘেঁটে ঘয়েষু দিদি,

বাংলা নতুন বছরের শুভেচ্ছা নেবেন। না থাক, শুধু প্রণাম। গুরুজন বলে কথা। আসলে দিদি, এই বছরটা আসলে আপনার জন্য কান্নার না হাসির তা নিয়ে এখন আর আমার মন দোটানায় নেই। বুঝে গেছি 'বাংলা' নিজের সংস্কৃতিকেই চায়। 'বাংলা' নিজের সন্তানদের নিজের রাজ্যেই রাখতে চায়। 'বাংলা' নিজের মেয়েদের সম্মান, নিরাপত্তা চায়।

বাকিটা আপনি বুঝে নিন। আমি আলাদা করে বলছি না। আমার মনে শুধু একটাই প্রশ্ন, ভবানীপুরও কি নিজের মেয়েকে আর চায়?

দিদি গো, আপনার কেন্দ্র ভবানীপুর থেকে বাদ পড়া ভোটারের সংখ্যা ৫০ হাজারের গণ্ডিও ছাড়িয়ে গেছে! বিবেচনাধীন তালিকা থেকেও অনেক নাম বাদ পড়েছে। প্রথমেই ভবানীপুরের ভোটার তালিকা থেকে ৪৭ হাজারের বেশি নাম কাটা হয়েছিল। নতুন করে বিবেচনাধীন তালিকার বাদের হিসেব যোগ হওয়ায় মোট নাম ৫০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয় দফায় ১৪ হাজার ১৫৪ জন ভোটারের নাম বিবেচনাধীন তালিকায় ছিল। এই নামগুলি যাচাই করে নিষ্পত্তি করেন কলকাতা হাইকোর্ট নিযুক্ত বিচারবিভাগীয় আধিকারিকেরা। সেখান থেকেই আরও ৩৫০০ নাম কাটা গেছে বলে শুনেছি। খবরের কাগজে পড়লাম বিচারকেরা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তথ্য যাচাই এবং নিষ্পত্তি করে এই নামগুলি বাদ দিয়েছেন। এর আগে খসড়া ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা মিলিয়ে ভবানীপুর থেকে মোট বাদ গিয়েছিল ৪৭ হাজার ১১২ জনের নাম। বিবেচনাধীন তালিকার নিষ্পত্তির পর বাদ পড়া নামের সংখ্যা দাঁড়াল ৫০ হাজার ৬১২।

কী হবে দিদি! গত বারেও তো ৩০ হাজারের কম ভোটে জিতেছিল আপনার দল। আর আপনি ২০১৬ সালে হাজার ২৬-এর মতো ভোটে। তবে কি এবার নন্দীগ্রাম হয়ে যাবে ভবানীপুর! খেয়াল রাখবেন দিদি, সিইএসসি তো আপনার কথায় চলে। ওদের বলে একটু যদি লোডশেডিং করিয়ে দেওয়া যায়। না, মানে তা হলে আপনি অন্তত এটা বলতে পারবেন যে, ওরা লোডশেডিং করে হারাল।

আর দিদি, আপনি কি একবার বিজেপির ভরসা পত্রটা দেখেছেন? আপনি যেভাবে মহিলাদের ভোট কিনতে চেয়েছিলেন তার উলটো পথে হেঁটে বিজেপি মহিলাদের সম্মান দেওয়ার কথা বলেছে। তাতে মহিলাদের আর্থিক সহায়তার কথা যেমন আছে তেমনই অন্য সম্মানের শপথও আছে।

স্বয়ং নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষার জন্য প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা ছাড়াও সরকারি চাকরিতে ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ দেওয়া হবে। সরকারি বাসে বিনামূল্যে পরিবহণ, নিরাপত্তা নিশ্চত করতে বিশেষ 'দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়ার্ড' গঠনের প্রতিশ্রুতিও আছে। তবে সবচেয়ে বড়ো ঘোষণা হলো, উচ্চশিক্ষার জন্য স্নাতক স্তরের ছাত্রীদের ভর্তির সময় ৫০,০০০ টাকা সহায়তা দেওয়া হবে। রাজ্য পুলিশে মাতঙ্গিনী হাজরা ও রানি শিরোমণির নামে দুটি মহিলা ব্যাটালিয়ন গঠন করা হবে।

মহিলাদের স্বাস্থ্য নিয়েও বড়ো শপথ আছে দিদি। ৪০ বছরের কম বয়সি মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে এইচপিভি ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। স্তন ক্যানসারের পরীক্ষা হবে বিনামূল্যে। আর আশা, অঙ্গনওয়াড়ি ও প্রাণী মিত্র কর্মীদের মাসিক সম্মানী বাড়ানো হবে। প্রতিটি জেলায় কর্মরত মহিলাদের জন্য হোস্টেল এবং প্রসূতিদের ২১ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা।

এসব দেখে আমার তো কাঁপুনি ধরে গেছে দিদি। তবু একটাই কথা বলি, যাই হোক না কেন স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখবেন। নতুন বছরে নতুন নতুন কবিতা আর ছবি চাই কিন্তু। বাঙ্গালিকে নিরাশ করবেন না। আমি কথা দিচ্ছি, এবার আপনি অনেক সময় পাবেন শিল্প চর্চার জন্য। □

অতিথি কলম

ডঃ মনমোহন বৈদ্য

# সঙ্ঘের পঞ্চ পরিবর্তন কর্মসূচি ভারতীয়ত্ব প্রতিষ্ঠারই সংকল্প

**মহান দর্শনের ভিত্তিতেই ভারত বিশ্ব-ভূমিকা পালনের জন্য সক্ষম, সক্রিয় ও সমর্থ হবে। এসবই ভারতের 'স্ব'-এর প্রকটীকরণ এবং স্বদেশি জীবনশৈলীর অভিন্ন অঙ্গ। এই দায়িত্ব রাষ্ট্র অর্থাৎ সমাজের।**

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ পূর্ণ হবার উপলক্ষ্যে সমাজের সঙ্গে ব্যাপক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য অনেক কার্যসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সমাজ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে পাঁচটি বিষয় নিয়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা বৃদ্ধি করা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস। এই অভিযানকে 'সজ্জন শক্তির জাগরণ' বলা হয়েছে। এর অন্তর্গত পঞ্চ পরিবর্তনে পাঁচটি বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে— স্বদেশি জীবনশৈলী বা নিজ জীবনে 'স্ব'-এর অভিব্যক্তি, নাগরিক শিষ্টাচার, পরিবার প্রবোধন, সামাজিক সমরসতা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ।

স্বদেশি জীবনশৈলীর সম্পর্কে সাধারণত যে যে বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে তা হলো বহুজাতিক কোম্পানির তৈরি জিনিসের বদলে স্বদেশি বস্তুর ব্যবহার, মাতৃভাষায় বার্তালাপের অভ্যাস, উৎসব-অনুষ্ঠানে পারম্পরিক ভারতীয় পোশাক পরিধান, পারম্পরিক খাদ্য গ্রহণ করা, নিজের নিজের ইষ্ট দেবতার ভজন-কীর্তন করা, নিজ বাড়ির পরিবেশ ভারতীয়ত্বের অনুসারে রাখা এবং ভ্রমণ করার সময় দেশের তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানের কথা মাথায় রাখা।

এছাড়াও স্বদেশি জীবনশৈলীর এক গভীর ও ব্যাপক অর্থও রয়েছে। এটি অনুধাবন করার জন্য সর্বপ্রথম 'স্বদেশি' শব্দের মধ্যে নিহিত 'স্ব'-এর অর্থ জানতে হবে। ভারতে এই 'স্ব'-এর তিনটি এমন দিক রয়েছে যা ভারতকে এক বিশিষ্ট পরিচিতি ও মহত্ব প্রদান করেছে। যখন এই তিনটি দিকই আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ব্যাবসায়িক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে স্বাভাবিকভাবে অভিব্যক্ত হয়, তখন সেই জীবন-পদ্ধতিকে সত্যিকারের অর্থে 'স্বদেশি জীবনশৈলী' বলা যেতে পারে। প্রশ্ন হলো, ভারতের 'স্ব'-এর তিনটি প্রধান দিক কী কী?

**প্রথম দিক ঃ আধ্যাত্মিকতা**

প্রথম ও মূল 'স্ব' হলো ভারতের আধ্যাত্মিকতা। ভারতের জীবনদৃষ্টির ভিত্তি আধ্যাত্মিক হওয়ার কারণে তা একাত্ম ও সর্বাঙ্গীণ। ভারতীয় দর্শনে সমগ্র সৃষ্টিকে একাত্ম মনে করা হয়। এই কারণেই 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-এর ভাবনা এখানে বিকশিত হয়েছে। ভারতীয় দৃষ্টিতে একই চৈতন্য বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য ভারত বিবিধতাকে বিভেদ রূপে দেখে না। বিবিধতার মাঝে একতাকে অনুভব করে। এখানে ঈশ্বরই স্ত্রী ও পুরুষ রূপে বিদ্যমান। মানব জীবনের অন্তিম লক্ষ্য হলো, নিজের অন্তঃ ও বাহ্য প্রকৃতিকে সংযমপূর্বক নিয়ন্ত্রণ করে দেবত্বে উন্নীত হয়ে মোক্ষ লাভ করা।

এই বিশ্ব চরাচরে ব্যাপ্ত চেতনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে তারই মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়াই মোক্ষ। এই লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ও রাজযোগের মধ্যে কোনো একটি, দুটি, তিনটি অথবা চারটিরই সাধনা করা যেতে পারে। প্রত্যেকে ব্যক্তি তার প্রকৃতি, রুচি ও সংস্কার অনুসারে যে কোনো পথ অবলম্বন করতে পারে। এই ব্যক্তিগত সাধনা পদ্ধতিকে উপাসনা (রিলিজিয়ন) বলা হয়েছে। ভারতে উপাসনার পথ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং তা গ্রহণ করায় প্রত্যেকের স্বাধীনতা রয়েছে। নিজের ব্যক্তিগত জিনিসের মতোই উপাসনাকেও একান্ত ব্যক্তিগত মনে করা হয়। এটি ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রের পরম্পরা। কিন্তু উপাসনা পদ্ধতিকে ভারতে ধর্ম বলা হয় না। ধর্মের পথে অগ্রসর হওয়ার একটি মাধ্যম। উপাসনা পদ্ধতি ধর্মের সমার্থক শব্দ নয়।

**রাজ্য ও রাষ্ট্র সম্পর্কে ভারতীয় ধারণা**

পশ্চিমি দেশগুলিতে রাষ্ট্রের কল্পনা রাজ্যভিত্তিক। ভারতে এর বিপরীত— জাতি বা সমাজই রাষ্ট্র, রাজ্য নয়। নাগরিকদের সুবিধা ও সুব্যবস্থার জন্য রাজ্যের রচনা করা হয়েছে। এই কারণেই

স্বাধীনতার পর যখন সংবিধান রচনা করা হয়েছে, তখন তার ভূমিকায় 'আমরা ভারতবাসী' শব্দ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রা সুব্যবস্থিত ও সুচারুভাবে চলে, তার জন্য আমরা ভারতবাসী মিলে কিছু নিয়ম তৈরি করেছি। সেই নিয়মগুলিকে পালন করা আমাদের দায়িত্ব ও অঙ্গীকার। এর জন্য প্রতিটি বিষয়ে সরকার বা সরকারি এজেন্সির ওপর নির্ভর করে থাকা উচিত নয়। যে নিয়ম আমাদের সমাজের জন্য আমরা নিজেরাই তৈরি করেছি, তার পালন কর্তব্যবোধের দ্বারা প্রেরিত হয়ে নিজেদেরই পালন করতে হবে। এটাই স্বদেশি জীবনশৈলীর গুরুত্বপূর্ণ স্বরূপ। সব বিষয়ে সরকারের ওপর নির্ভর করে থাকা স্বদেশি মানসিকতা নয়।

**দ্বিতীয় দিক ঃ সমাজভিত্তিক রাষ্ট্র**

দ্বিতীয় দিক হলো, ভারত সমাজভিত্তিক রাষ্ট্র। ভারতীয় রাষ্ট্র কখনোই রাজ্য আধারিত ছিল না। 'ওয়েলফেয়ার স্টেট'-এর ধারণা পশ্চিমি; ভারতীয় নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে লিখেছেন, চিরাচরিতভাবে ভারতের বিচার ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সুরক্ষা এবং বিদেশনীতির মতো বিষয়গুলি রাজ্যের হাতে থাকতো। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কলকারখানা, ব্যবসা, কলা, সঙ্গীত নাটক, যাত্রা, তীর্থব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্ত জীবনোপযোগী ব্যবস্থা সমাজ দ্বারা পরিচালিত হতো। এসব কাজের জন্য অর্থ সরকারের থেকে নেওয়া হতো না। সমাজ স্বয়ং বহন করতো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, ' যে সমাজ তার প্রয়োজনের জন্য সরকারের ওপর ন্যূনতম নির্ভর করে তাকেই স্বদেশী সমাজ বলা হয়।

**তৃতীয় দিক ঃ জীবনের পূর্ণতার দৃষ্টিভঙ্গি**

ভারতীয় জীবন দর্শনে পার্থিব সমৃদ্ধি (অভ্যুদয়) এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি (নিঃশ্রেয়স) দুই-ই একসঙ্গে জীবনের পূর্ণতা প্রদান করে। কেবলমাত্র পার্থিব সমৃদ্ধি অথবা ত্যাগ— এই দুয়ের কোনো একটিকে অপূর্ণ মনে করা হয়। এই ভাবকে ধর্মের পরিভাষায় ব্যক্ত করা হচ্ছে— ' যতোহভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ সঃ ধর্মঃ'। অর্থাৎ পার্থিব উন্নতি এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ— দুয়েরই সিদ্ধি লাভ হোক, এটাই ধর্ম।

**সমরসতা ঃ ভারতের 'স্ব'-এর স্বাভাবিক স্বরূপ**

ভারতের আধ্যাত্মিকতায় মনে করা হয় যে, একই চৈতন্য সম্পূর্ণ বিশ্ব চরাচরে ব্যাপ্ত রয়েছে। সেজন্য সমাজে যেকোনো কাজ করা ভাই বা বোন, তার মধ্যে যে চৈতন্য তা আমার মধ্যেও বিদ্যমান। এরকম ভাবনায় জাতিগত উচ্চ-নীচ মানসিকতার কোনো স্থান থাকতে পারে না। থাকলে তা 'স্ব'-এর অভিব্যক্তি নয়। জীবিকার জন্য সমাজে অনেক রকমের কাজ করতে হয়। সব কাজই সমাজের জন্য প্রয়োজনীয়। কোনো কাজ ছোটো অথবা বড়ো নয়। উপার্জনের পথ আলাদা আলাদা হতে পারে, কিন্তু মানুষের মূল্য তার কাজ অথবা পেশার দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না। উচ্চ-নীচ ভাব ভারতের পরম্পরার সঙ্গে খাপ খায় না।

আমাদের মূল ভাব হলো, 'হিন্দবঃ সোদরা সর্বে'। অর্থাৎ সমস্ত হিন্দু ভারতমাতার সন্তান, সবাই সমান, ভাই-ভাই। এজন্য স্বদেশি জীবনশৈলীর অর্থ হলো, সমস্ত প্রকার ভেদাভেদ ভুলে সমাজে আপনত্ব, আত্মীয়তা ও সমরসতার পরিবেশ নির্মাণ করতে হবে। আমাদের পরিবারে, মিত্রমণ্ডলীতে এবং সামাজিক জীবনে সমস্ত শ্রেণী, বর্গ ও পেশায় যুক্ত মানুষের স্বাভাবিক সমাবেশ থাকা প্রয়োজন। এটাই সত্যিকারের স্বদেশি জীবনশৈলী।

**সন্ত পরম্পরায় সমরসতার উদাহরণ**

জগদ্‌গুরু আদি শঙ্করাচার্যের জীবনের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একবার তিনি কাশীতে গঙ্গাস্নান করে উপরে উঠছিলেন। তখনই তাঁর সামনে দিয়ে এক চণ্ডাল স্নান করার জন্য নামছিল। শঙ্করাচার্য তাকে বললেন, দূর হটো, দূর হটো। চণ্ডাল প্রশ্ন করল, কারে দূরে হটতে বলছেন? আমার শরীরকে? আমার শরীর আর আপনার শরীর তো একই পঞ্চমহাভূতে তৈরি। আমার আত্মাকে? আপানার ভেতরে যে আত্মা রয়েছে, সেই আত্মাই তো আমার ভেতরে রয়েছে। একথা শুনতেই শঙ্করাচার্য বুঝে গেলেন যে, এ কোনো সাধারণ ব্যক্তি নন, ইনি সাক্ষাৎ শিব। তৎক্ষণাৎ তিনি সেই চণ্ডালের চরণে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। এই ঘটনা ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার এক জীবন্ত উদাহরণ। এরকমই দক্ষিণ ভারতের মহান সন্ত রামানুজাচার্যের জীবনের এক প্রেরণাদায়ী প্রসঙ্গ রয়েছে। তিনি বৃদ্ধাবস্থায় প্রতিদিন কাবেরীনদীতে স্নান করতে যাওয়ার সময় দুজন ব্রাহ্মণ শিষ্যের কাঁধে দুই হাত রেখে যেতেন। কিন্তু স্নান সেরে ফেরার সময় দুজন তথাকথিত অস্পৃশ্য শিষ্যের কাঁধে হাত রেখে উঠে আসতেন। এক শিষ্য এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, নদীতে স্নান করে আমি আমার শরীর শুদ্ধ করি কিন্তু ফেরার সময় ওই বন্ধুদের সাহায্য নেবার ফলে আমার মন শুদ্ধ হয়ে যায়। এরকম অনেক উদাহরণ আমাদের ইতিহাসে রয়েছে। সেগুলি স্মরণ করে আমরা নিজেদের জীবনে 'স্ব'-এর ভাব জাগ্রত করতে পারি। এভাবে সকলের প্রতি সমান আত্মীয়তা ও সমরস ব্যবহার জীবনে চলার পথে গ্রহণ করা উচিত।

**পরিবেশ রক্ষা এবং ভারতের 'স্ব' ভাব**

ভারতীয় দর্শনে বলা হয়েছে, 'মাতা

*With Best Compliments from -*

**A**

**Well Wisher**

ভূমিঃ পুত্রোহহং পৃথিব্যাঃ'। এই ভূমাতা পৃথিবী আমার মা আর আমি তাঁর সন্তান। এটাই ভারতের 'স্ব' ভাব। কিন্তু পশ্চিমের বিকাশ মডেলের অন্ধানুকরণ করতে গিয়ে আমরা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে গভীর সংকটের সৃষ্টি করেছি। এই প্রকৃতি আমাদের মা। এজন্য নিজের প্রয়োজন অনুসারে তার ব্যবহার (দোহন) করা উচিত, শোষণ নয়।

**একটি প্রতীকাত্মক উদাহরণ**

একবার নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে। চারজন প্রার্থী দাঁড়িয়েছে। চারজনেরই বিষয় জলদূষণ, বায়ুদূষণ, মাটি দূষণ ও খাদ্যদূষণ। চারজনেই তাদের প্রতীক চিহ্ন 'মানুষ' দাবি করেছে। নির্বাচন কমিশন বলেছে, যেকোনো একজন এই প্রতীক পাবে। আর যে উপযুক্ত কারণ বলতে পারবে তাকেই এই চিহ্ন দেওয়া হবে। এক-এক করে সব প্রার্থীই বলল, 'মানুষই আমাদের জন্ম দিয়েছে, মানুষই আমাদের পালন-পোষণ করেছে, এখন আমরা এত বড়ো হয়ে গেছি যে আমরা নির্বাচনে লড়ার যোগ্য হয়েছি, এসবই মানুষ হিসেবেই পাওয়া।' এই উহাদরণ আমাদের ভাবতে বাধ্য করছে যে, আমরা সময় থাকতে যদি আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন না করি, তাহলে আমাদেরই তৈরি সমস্যা আমাদেরই সামনে দাঁড়িয়ে পড়বে। এখানে যে প্রতীকাত্মক উদাহরণের উল্লেখ করা হলো, তাদের জন্মদাতা 'মানুষ' কোনো পিছিয়ে পড়া বর্গ, দরিদ্র অথবা অবিকশিত সমাজের নয়। প্রকৃত অর্থেই তারা তথাকথিত বিকশিত, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল বলা মানবগোষ্ঠী, যাদের গত পাঁচশো বছরের বিকাশ মডেল আজ জল, বায়ু, ভূমি ও খাদ্যশস্যের মতো জীবনোপযোগী জিনিসগুলিকে সংকটের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এর বিপরীতে, ভারতের রাষ্ট্রজীবন কমপক্ষে কুড়িহাজার বছরেরও বেশি পুরনো এবং তা প্রকৃতির সঙ্গে ভারসাম্য রেখে চলেছে। এজন্য পরিবেশ ও তার ভারসাম্য রক্ষার বিষয় স্বদেশি জীবনশৈলীর অবিভাজ্য অঙ্গ। শুধু ভাষণে নয়, শুধু ভাবনায় নয়, দৈনন্দিন আচরণে আনতে হবে জলের অপচয় রোধ, প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহার না করা, গাছ লাগানো ও তাকে রক্ষা করা। এগুলি স্বদেশি জীবনশৈলীর সহজ আচরণ।

**'আমি' থেকে 'আমরা'-র দিকে যাত্রা**

পশ্চিমি চিন্তন মানুষকে ব্যক্তিবাদী ও ভোগবাদী করে তোলে। কিন্তু ভারতীয় চিন্তনে সমাজের সবচেয়ে ছোটো একক ব্যক্তি নয়, পরিবারকে মনে করে। পরিবার ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য ব্যক্তিকে 'আমি' থেকে 'আমরা'-তে বিলীন হতে হয়। এটিই ভারতের আধ্যাত্মিক যাত্রা 'আমি' থেকে 'আমরা'-র দিকে। এই যাত্রা পরিবার থেকে শুরু হয়ে ক্রমশ পরিজন, গ্রাম বা শহর, রাজ্য, রাষ্ট্র, সমগ্র মানব জাতি এবং সমগ্র বিশ্ব চরাচর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ক্রমকে ভারতীয় দর্শনে ব্যষ্টি, সমষ্টি, সৃষ্টি ও পরমেষ্টির সোপান বলা হয়েছে। এই দীর্ঘ আধ্যাত্মিক যাত্রার প্রারম্ভবিন্দু হলো 'পরিবার'। এজন্যই চার আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থাশ্রমকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

**ভারতের বিশ্বদায়িত্ব এবং পরিবারের ভূমিকা**

আজ প্রযুক্তির কারণে বিশ্ব সংকুচিত হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি, ভাষা, জাতিগত বিবিধতা এবং সীমিত সম্পদের মধ্যে সমগ্র মানবজাতি কীভাবে সমৃদ্ধ, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও শান্তিময় জীবনযাপন করতে পারে তার সমাধানের রাস্তা ভারতের কাছেই রয়েছে। এই জ্ঞান ভারতের অধ্যাত্মভিত্তিক জীবনচিন্তন থেকে উৎপন্ন। এর দীর্ঘ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাও ভারতের রয়েছে। এজন্য মানব কল্যাণের স্বার্থে প্রয়োজন এক সমৃদ্ধ, সমর্থ ও আত্মবিশ্বাসী রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের দাঁড়িয়ে থাকা এবং তার ভারতীয়ত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখা।

ভারতের দর্শন মহান। কিন্তু সেই মহানতাকে টিকিয়ে রাখার মতো সমর্থ সমাজ যদি তৈরি না হয়, তবে সেই জ্ঞান কেবলমাত্র বইপুঁথিতে এবং আলোচনার মধ্যেই সীমিত থেকে যাবে। ভারতের এই মহান দর্শনকে আচরণের মধ্যে আনার মতো সমাজ পরিবার ব্যবস্থার মাধ্যমেই তৈরি হবে। কোনো পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সন্তানদের এই মহান দর্শন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পরিচিত করাবার প্রাথমিক দায়িত্ব পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের ওপরেই থাকে। বিদ্যালয় ও সমাজের ভূমিকা এর পরে আসে। পরিবারকে নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য বংশ বড়ো হওয়াও আবশ্যক। সাধারণত প্রতি পরিবার ২.১ অর্থাৎ তিন সন্তান পরিবার টিকে রাখার জন্য প্রয়োজন। যদি পরিবারের সমস্ত সদস্য অন্তত সপ্তাহে একদিন একসঙ্গে বসে, আলাপ আলোচনা করে, তাহলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রবাহ সহজভাবে চলতে থাকবে।

এর ভিত্তিতেই ভারত বিশ্ব-ভূমিকা পালনের জন্য সক্ষম, সক্রিয় ও সমর্থ হবে। এসবই ভারতের 'স্ব'-এর প্রকটীকরণ এবং স্বদেশি জীবনশৈলীর অভিন্ন অঙ্গ। এই দায়িত্ব রাষ্ট্র অর্থাৎ সমাজের। রাজ্য এতে সহায়ক হতে পারে। কিন্তু মূল দায়িত্ব সমাজের। আর সেই ভূমিকা নির্মাণে পরিবারের ভূমিকা প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণেই পরিবার প্রবোধনের বিশেষ ও অনিবার্য গুরুত্ব।

*(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডলের সদস্য)*

## শোক সংবাদ

মালদা জেলার গাজোলের স্বয়ংসেবক তথা ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রমুখ কাজল কুমার কুণ্ডুর মাতৃদেবী মীনারানি কুণ্ডু গত ৭ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি ১ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনি এবং বহু গুণমুগ্ধ আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

তাঁর স্বামী প্রয়াত কালাচাঁদ কুণ্ডু গাজোলের প্রবীণ স্বয়ংসেবক ছিলেন।

# কালিয়াচকে বিচারপতিদের ওপর জেহাদি তাণ্ডব

# নির্বাচন কমিশন ও বিচারব্যবস্থা চুপ কেন?

**মণীন্দ্রনাথ সাহা**

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার অজুহাতে গত ১ এপ্রিল দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মালদা জেলার কালিয়াচক থানার মোথাবাড়ি, সুজাপুর-সহ বিভিন্ন এলাকা। এই ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর ২ তারিখ সন্ধ্যায় নির্বাচন কমিশন এনআইএ-র হাতে ঘটনার তদন্তভার তুলে দেয়।

২ এপ্রিল সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চ কালিয়াচকের ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে শুনানি শুরু করে। শীর্ষ আদালত ঘটনার তদন্তভার সিবিআই অথবা এনআইএ-র হাতে দিতে এবং তদন্তকারী সংস্থার প্রাথমিক রিপোর্ট বাধ্যতামূলক আদালতে জমা দিতে হবে বলেছে। সে কারণেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার রাজ্যের সিইও এবং পুলিশ প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এই ঘটনায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানো হয়েছে এবং ২ তারিখ রাত বারোটার মধ্যে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে যে, এসআইআর-এর কাজে নিযুক্ত এক মহিলা-সহ সাতজন বিচারককে কালিয়াচক-২ ব্লক অফিসের মধ্যে রাত ১২টা পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখে জেহাদি জনতা। ১৮ ঘণ্টা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে চলে বিক্ষোভ। কলকাতার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল বিষয়টি সুপ্রিমকোর্টকে জানান। তারপরই ২ তারিখ সকালে এসআইআর মামলাটি শুনতে চায় সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের বেঞ্চ। ক্ষুব্ধ শীর্ষ আদালতের বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, এটি বিচারকদের ভয় দেখানোর একটা স্পষ্ট চেষ্টাই শুধু নয়, এর উদ্দেশ্য আদালতকেও চ্যালেঞ্জ জানানো। এটি কোনো সাধারণ ঘটনা নয়। বরং মনে হচ্ছে, এটি পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপ, যার লক্ষ্য ছিল বিচারকদের মনোবল ভেঙে দেওয়া এবং বাকি মামলাগুলির আপত্তি নিষ্পত্তির গোটা প্রক্রিয়াই বন্ধ করে দেওয়া। তিনি আরও বলেন, 'কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছি।'

কালিয়াচক কাণ্ডে মোথাবাড়ির আইএসএফ প্রার্থী শাজাহান আলিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এছাড়া বিভিন্ন এলাকা থেকে ধরা হয়েছে আরও ৪২ জনকে। তার সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মোফাক্কেরুল ইসলামকেও। জানা গিয়েছে, এর মূল প্ররোচনাদাতা মোফাক্কেরুলের সঙ্গে তৃণমূলের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মমতা ব্যানার্জি-সহ একাধিক তৃণমূল নেতার সঙ্গেও একমঞ্চে তাকে দেখা গিয়েছে। তাকে গ্রেপ্তার করিয়ে হয়তো কোনো ষড়যন্ত্র আড়াল করতে চাইছে তৃণমূল সরকার বলে মনে করছেন অনেকেই। এদিন রাজ্যপুলিশের ডিজি ও মালদার এসপি-র সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে জ্ঞানেশ কুমার জানতে চেয়েছেন, কেন মালদার ঘটনায় সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করা হয়নি এবং কলকাতায় সিইও দপ্তরের সামনে কেন দুদিন ধরে গণ্ডগোল হচ্ছে, কেন এত লোকের জমায়েত হচ্ছে?

এছাড়া শীর্ষ আদালতের শুনানিতে আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি, মালদার জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারকে শোকজ করেন প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের নির্দেশ, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির চিঠির প্রেক্ষিতে কেন তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে না, তা কারণ-সহ জানাতে হবে। ৬ এপ্রিল পরবর্তী শুনানিতে ভার্চুয়াল মাধ্যমে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছিল তাদের। এছাড়াও সুপ্রিমকোর্ট এদিন যে পর্যবেক্ষণ করেছে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শীর্ষ আদালত মনে করে, 'পশ্চিমবঙ্গের মতো এতটা রাজনৈতিকভাবে মেরুকরণ আগে কখনো কোনো রাজ্যে দেখা যায়নি। পশ্চিমবঙ্গে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেখানে প্রায় সবকিছুকেই রাজনৈতিক ভাষায় ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এমনকী আদালতের নির্দেশ পালন নিয়েও রাজনীতির ছাপ স্পষ্ট।'

সুপ্রিমকোর্টে শুনানির পরেও নতুন করে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে পুরাতন মালদা ব্লকের মঙ্গলবাড়ি এলাকায়। ফের অবরুদ্ধ হয় ১২নং জাতীয় সড়ক। পুলিশের গাড়িতেও ভাঙচুর চালায় বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেরা। ঘটনায় আহত হয়েছেন গাড়ির চালক। অবশেষে অতিরিক্ত জেলাশাসকের হস্তক্ষেপে চারঘণ্টা পর অবরোধ উঠে যায়।

অন্যদিকে, গত ১ এপ্রিল কালিয়াচক-২ বিডিও অফিসে বিক্ষোভকারীদের হাতে দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকা বিচারকদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার সময় হামলার মুখে পড়েন তাঁরা। সেই সময় এক মহিলা বিচারকের মুখে কাতর আর্তি শোনা যায়। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি অডিয়ো রেকর্ডিংয়ে তাঁকে বলতে শোনা যায়— 'আমার পাইলট কার নেই। দুর্ঘটনায় পড়েছে পাইলট কার। আমি একা একা যাচ্ছি। ওরা ইট, বাঁশ নিয়ে আসছে। আমার কিছু হয়ে গেলে হাইকোর্ট যেন আমার সন্তানকে দেখে।'

এদিনের ঘটনাকে প্রশাসনিক ব্যর্থতা হিসেবে ব্যাখ্যা করে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য— 'মুখ্যসচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি এবং হোয়াটস্অ্যাপে বার্তা পাঠানোর জন্য তাঁর নম্বরও পাওয়া যায়নি। এই ঘটনা রাজ্য প্রশাসনের সম্পূর্ণ ব্যর্থতাকে প্রকাশ করে। মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, পুলিশের ডিজি এবং এসপি-র আচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয়। বিষয়টি জানানো সত্ত্বেও তাঁরা কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নিতে কেন ব্যর্থ হয়েছেন, তা তাঁদের ব্যাখ্যা করতে হবে।' বিচারপতির আরও সংযোজন— 'বিচারকরা নিরপেক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত

ফঃ ২

ব্যক্তি। তাই তাঁরা হামলার শিকার হওয়া মানে আরও অসুস্থতার লক্ষণ।’

১২ ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকার পর বিচারকদের গাড়ি যখন কলকাতার উদ্দেশে রওনা হয়েছিল, তখন মালদহের কোনো পুলিশ, প্রশাসন বিচারকদের গাড়ির সামনে ও পিছনে পুলিশি নিরাপত্তা দেয়নি। সুতরাং জেলার পুলিশ সুপার, আইসি, ওসি সবাইকে বিচারের আওতায় আনা উচিত বলে অনেকের অভিমত।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে, তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের উসকানিতেই অশান্ত মোথাবাড়ি, আক্রান্ত বিচার বিভাগীয় আধিকারিক। মোথাবাড়ির ঘটনায় অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী তৃণমূলের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। কেননা তিনিই এসআইআর নিয়ে হুমকি দিয়েছিলেন— ভোটার তালিকা থেকে একটা নাম বাদ গেলে মোথাবাড়ি লণ্ডভণ্ড করে দেবে। মোথাবাড়ির এই অশান্তি পূর্বপরিকল্পিত এবং সাবিনা ইয়াসমিন এই পরিকল্পনার মূল কারিগর। কাজেই অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের স্বার্থে ষড়যন্ত্রকারী ও প্ররোচনাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে বলে দাবি উঠেছে। মালদা জেলার এসপি এবং ডিএম-কে কেন সাসপেন্ড করা হলো না এখন পর্যন্ত সেই দাবি তুলে অনেকেই রাজ্যে অবিলম্বে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন চাইছেন।

কালিয়াচকের ঘটনার জন্য কেউ কেউ বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনসভা থেকে অনেক উসকানিমূলক বক্তব্য রাখেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশন যেমন কখনো মুখ্যমন্ত্রীকে শোকজ করে না, তেমনি শীর্ষ আদালত এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের পর্যবেক্ষণ এবং সংশোধনের বাণী ছাড়া কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কাজেই যা হওয়ার তাই ঘটে চলেছে বারবার।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আতঙ্কের কারণ হলো, কালিয়াচক-২ ব্লকের বিডিও অফিসে জুডিশিয়াল রিভিউ করা বিচারকদের ঘেরাও করে বিচারকদের ফাঁসি চেয়ে এবং তার সঙ্গে দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে ভয়ানক স্লোগান দিয়ে একটা মারাত্মক জেহাদি তাণ্ডব চলেছিল, সেটা বেশ উদ্বেগজনক এ রাজ্যের পক্ষে। গত ২ এপ্রিল কলকাতায় ভবানীপুর বিধানসভায় শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়ন ঘিরে ব্যাপক গোলমাল হয় এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কনভয় ঘিরে প্রবল বিক্ষোভ হয় যা এই রাজ্যের জন্য ভীষণ উদ্বেগজনক।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেকেই বলছেন, পশ্চিমবঙ্গের এখন যা আইন শৃঙ্খলার অবস্থা তাতে যদি কেন্দ্রীয় সরকার খুব কড়া ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি না করে তাহলে ভবিষ্যতে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও আক্রান্ত হতে পারেন এই রাজ্যে। যদিও বর্তমানে তাঁদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুব জোরদার এবং বড়ো ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা খুব কম। তবুও যদি বড়ো কিছু ঝামেলা হয়ে যায় তাহলে যে ঝড় উঠবে সেটা সামলানো খুব কঠিন হবে সারা দেশের এমনকী পশ্চিমি দেশগুলিতে এনআরআই বাঙ্গালির পক্ষেও।

ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে ১৯৮৪ সালে তাঁর ওপর দুই শিখ দেহরক্ষীর গুলি চালিয়ে হত্যা করার পরে যে আক্রমণ হয়েছিল শিখদের ওপর, আজকের দিনে প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপর আঘাত এলে পরিস্থিতি কিন্তু তারচেয়ে হাজার গুণ ভয়াল চেহারা নেবে মনে করে অনেকেই আতঙ্কিত। গোটা উত্তর ও পশ্চিম ভারত, অন্ধ্র, কর্ণাটক, বিহার, ওড়িশা, ওদিকে ত্রিপুরা বাদে গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতে থাকা বাঙ্গালিদের ওপর নানাভাবে আক্রমণ নেমে আসতে পারে। বিভিন্ন রাজ্যের সেনা, আধাসেনা, পুলিশ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ মারাত্মকভাবে তেড়ে আসবে। যা কল্পনারও অতীত হতে পারে।

কাজেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে শান্ত রাখতে এবং দেশ-বিদেশের সমস্ত বাঙ্গালির জীবন সুরক্ষিত রাখতে হলে অবিলম্বে ভারতীয় সংবিধান নির্দেশিত পথে রাজ্যের প্রতি কঠোর পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি বলে অনেকেই মনে করছেন। ▫

PEAK

# SAMAL HARAND OF INDIA PRIVATE LIMITED

*(An ISO 9001 : 2015 certitied company)*

Regd. Office :

Chatterjee International Centre,

33A, J. L. Nehru Road

4th Floor, Flat No. A-5, Kolkata - 700 071

West Bengal, India

## রক্তাক্ত স্মৃতি থেকে পুনর্জীবন

# কাশ্মীরের মন্দির ও মানবিক প্রত্যাবর্তন

**সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী**

কাশ্মীরে হিন্দু পণ্ডিতদের পুনর্বাসন হবে এবং সেখানে পরিত্যক্ত মন্দিরে পুনরায় পূজার্চনা শুরু হবে জেনে মনটা খুশিতে আটখানা হয়ে গেল। কেন্দ্রীয় সরকারের অব্যর্থ পারঙ্গমতার জন্য আমরা সনাতনীরা সরকারি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। যে মাটি পণ্ডিতদের রক্তে রঞ্জিত সেখানে আবারো ধূপের গন্ধে বাতাস ভরে উঠবে। এই সংবাদ শুনে যারপরনাই আমরা খুশি। দীর্ঘদিনের পরে কাশ্মীরে আবারও শান্তির পরিবেশ ফিরে আসছে, এটা বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের একটা বিশেষ সাফল্য। এটি এক সংবেদনশীল ও বহুস্তরীয় আলোচনা, যেখানে বিশ্বাস, ইতিহাস ও শাসনব্যবস্থা এক জটিল বিন্যাসে এসে মিলিত হয়। জম্মু ও কাশ্মীরে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা মন্দিরগুলি পুনরায় খোলার উদ্যোগ সেই বাস্তবতারই একটি প্রতিফলন। বিষয়টি শুধুমাত্র ধর্মীয় পরিসরের নয়; বরং এটি রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও মানসিক পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া, যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

ঐতিহাসিকভাবে জম্মু ও কাশ্মীর ভারতীয় ঐতিহ্যের মিলনভূমি। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত, হিংসা, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের ফলে এই অঞ্চলের বহু প্রাচীন মন্দির পরিত্যক্ত বা অচল হয়ে পড়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে মন্দির পুনরায় খোলার উদ্যোগকে অনেকেই একটি সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের সূচনা হিসেবে দেখছেন। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে কেবল ধর্মীয় অনুশীলনের ক্ষেত্রেই পুনরুদ্ধার হবে না, বরং একটি হারিয়ে যাওয়া ঐতিহাসিক স্মৃতি, পরিচয় ও উত্তরাধিকারও পুনরুজ্জীবিত হবে।

বিশ্বাসের দিক থেকে এই উদ্যোগের তাৎপর্য গভীর। বহু মানুষের কাছে এই মন্দিরগুলি কেবল স্থাপনা নয়;এগুলো তাদের পূর্বপুরুষদের স্মৃতি, আধ্যাত্মিক আশ্রয় এবং পরিচয়ের অংশ। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার ফলে যে বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছিল, তা দূর করে মন্দিরগুলি পুনরায় খুলে দেওয়া হলে মানুষের মধ্যে একটি মানসিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ পুনঃস্থাপিত হবেই। বিশেষ করে যারা বাস্তুচ্যুত হয়েছেন বা কাশ্মীর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন, তাদের জন্য এটি এক ধরনের প্রতীকী প্রত্যাবর্তন এবং আত্মপরিচয়ের বিশাল পুনর্নির্মাণ।

এই প্রসঙ্গে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য বিষয় হলো কাশ্মীরি পণ্ডিতদের পুনর্বাসন। নব্বইয়ের দশকে

ইসলামি সন্ত্রাস ও হিংসার প্রেক্ষাপটে বিপুল সংখ্যক কাশ্মীরি পণ্ডিত তাদের বসতভিটা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন, বলা ভালো, বিতাড়িত হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক বাস্তুচ্যুতি শুধু একটি সমাজের ভৌগোলিক স্থানচ্যুতি নয়, বরং তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের ওপর গভীর আঘাত। তাই মন্দির পুনরায় খোলার উদ্যোগ তখনই পূর্ণতা পাবে, যখন তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে পণ্ডিত সমাজের নিরাপদ, সম্মানজনক ও স্থায়ী পুনর্বাসনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে। সরকারের কাছে এখানে দায়িত্ব শুধু পরিকাঠামোগত উন্নয়ন বা নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং একটি নিশ্চয়তার পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলি স্বেচ্ছায় ও নিরাপদে ফিরে আসতে পারেন। পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন সুপরিকল্পিত আবাসন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ এবং সর্বোপরি একটি সামাজিক পরিবেশ, যেখানে তারা নিজেদেরকে নিরাপদ ও স্বীকৃত অনুভব করবেন। একই সঙ্গে স্থানীয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে পারস্পরিক সহাবস্থান ও সম্প্রীতির ভিত্তি গড়ে তোলাও অত্যন্ত জরুরি।

অর্থনৈতিক দিক থেকেও এই উদ্যোগের সম্ভাবনা গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় পর্যটন বিশ্বের বহু অঞ্চলে অর্থনীতির একটি শক্তিশালী চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। জম্মু ও কাশ্মীরে যদি এই মন্দিরগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পুনরুদ্ধার ও পরিচালনা করা যায়, তবে তা তীর্থযাত্রী ও পর্যটকদের আকর্ষণ করবে। এর ফলে স্থানীয় ব্যবসাবাণিজ্য, হোটেল-পর্যটন শিল্প, পরিবহণ ব্যবস্থা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। একটি সুপরিকল্পিত পর্যটন নীতি এই অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে এই পুরো প্রক্রিয়া একেবারেই সরল বা একমুখী নয়।

এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা সংবেদনশীল ও জটিল প্রশ্ন, যেগুলোকে উপেক্ষা করা হলে এই উদ্যোগ উলটো বিতর্ক ও অস্থিরতার কারণ হয়ে উঠতে পারে। প্রথমত, আইনি দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বহু মন্দিরের জমি বা সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, যা নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘদিন অবহেলিত থাকার কারণে অনেক স্থাপনার কাঠামোগত অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই পুনরুদ্ধার কাজের আগে প্রকৌশলগত মূল্যায়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

এছাড়া, প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা সমন্বয় এই উদ্যোগের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। জম্মু ও কাশ্মীর একটি রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল অঞ্চল, যেখানে যেকোনো ধর্মীয় পদক্ষেপ সহজেই বৃহত্তর রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিতে পারে। তাই এই ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি ভারসাম্যপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তি-মূলক ও দূরদর্শী নীতি গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। এই প্রেক্ষাপটে একটি সুসংগঠিত ও ধাপে ধাপে এগোনো প্রক্রিয়া অপরিহার্য। প্রথম ধাপে প্রয়োজন ঐতিহ্য ও ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়ন; যাতে নির্ধারণ করা যায় কোন মন্দিরগুলি সংরক্ষণযোগ্য এবং তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কতটা।

দ্বিতীয় ধাপে প্রয়োজন প্রশাসনিক অনুমোদন এবং আইনি স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। তৃতীয় ধাপে স্থানীয় মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং পরামর্শ গ্রহণ, যা এই উদ্যোগকে আরও গ্রহণযোগ্য এবং স্থায়ী করে তুলবে। চতুর্থত, পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ কাজের জন্য বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ততা এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য যেন শুধুমাত্র স্থাপনা পুনরায় খোলা না হয়ে, বরং একটি বৃহত্তর সামাজিক আস্থা পুনর্গঠন এবং সহাবস্থানের সংস্কৃতি গড়ে তোলা হয়। ইতিহাস আমাদের বারবার দেখিয়েছে, একতরফা বা তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্ত দীর্ঘমেয়াদে বিভাজন এবং অস্থিরতা বাড়ায়। তাই এখানে প্রয়োজন সংলাপ, সহমর্মিতা এবং পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। এছাড়া, এই উদ্যোগের একটি মনস্তাত্ত্বিক দিকও রয়েছে। দীর্ঘদিনের সংঘাত মানুষের মনে যে অবিশ্বাস, ভয় ও বিচ্ছিন্নতা তৈরি করেছে, তা দূর করতে প্রতীকী পদক্ষেপগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে সেই প্রতীক যেন বিভাজনের নয়, বরং সংহতির বার্তা বহন করে; সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

পরিশেষে বলা যায়, জম্মু ও কাশ্মীরে পুনরায় মন্দির খোলার উদ্যোগ এবং কাশ্মীরি পণ্ডিতদের পুনর্বাসন— এই দুটি বিষয় পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। একটির সফলতা অন্যটির ওপর নির্ভরশীল। যদি এই উদ্যোগগুলো সমন্বিত, স্বচ্ছ এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বাস্তবায়িত হয়, তবে এটি কেবল একটি ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ নয়; বরং সামাজিক সম্প্রীতি, ন্যায়বিচার এবং স্থিতিশীলতার একটি নতুন অধ্যায় রচনা করতে পারে।

এই সিদ্ধান্তগুলো কেবল অতীতের ক্ষত সারানোর নয়; বরং একটি ন্যায়ভিত্তিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার দায়বদ্ধ প্রয়াস হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। □

# পৃথিবী পালটে দেওয়া একটি ‘গোপন বক্তৃতা’

**পিন্টু সান্যাল**

একটি গোপন বক্তৃতা, ‘Secret Speech’।

কোনো সাংবাদিক বা বিদেশি প্রতিনিধির উপস্থিতি ছিল না। কিন্তু এই বক্তৃতা দেওয়ার সময় যতটা গোপনীয়তা রাখা হয়েছিল, ততটাই বা ততোধিক চেষ্টা ছিল এই বক্তৃতাকে ছড়িয়ে দেওয়ার।

এই ‘Secret Speech’ সম্পর্কে যখন লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ বন্দি জানতে পারলো তারা নতুন জীবনের আশা করতে শুরু করলো— এ যেন নতুন সূর্যোদয়।

শুধু সেই দেশ নয়, এমনকী সারা পৃথিবী নৃশংসতার কালো অধ্যায় থেকে বেরিয়ে আসার সূচনা হয়েছিল এই বক্তৃতার পর থেকে।

যদি বক্তার স্মৃতিচারণকে তার সততা হিসেবে বিশ্বাস করা যায়, তাহলে বলা যায় কমপক্ষে ২০ বছর এই কথাগুলো বলবার জন্য অপেক্ষা করেছেন এই ‘Secret Speech’ দেওয়ার প্রয়োজনীয় সাহস ও সঠিক সুযোগ অর্জনের জন্য।

আজ সেই দিন।

১৯৫৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি।

এই ‘Secret Speech’ ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে ‘On the Cult of Personality and its Consequences’ নামে।

বক্তা, নিকিতা ক্রুশ্চেভ (Nikita Khrushchev), কমিউনিস্ট পার্টি অফ সোভিয়েত ইউনিয়নের ফার্স্ট সেক্রেটারি।

কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম পার্টি কংগ্রেস ২৪ ফেব্রুয়ারিতেই শেষ হওয়ার কথা কিন্তু প্রতিনিধিদের কাছে খবর এলো ক্রেমলিনের বিখ্যাত সভাকক্ষে, বিশেষ একটি সভা হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইরের কোনো সহযোগী দলের প্রতিনিধি, কোনো সাংবাদিক থাকতে পারবেন না; যারা থাকতে পারবেন তাদের বিশেষ অনুমতি দেওয়া হলো আর অনুমতি পেলেন সদ্য সোভিয়েত বন্দিশিবির থেকে মুক্তি পাওয়া ১০০ জন প্রাক্তন পার্টির সদস্য।

২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যরাত্রিতে ক্রুশ্চেভ বলতে শুরু করেন আর পরবর্তী ৪ ঘণ্টা সেই সত্যটাকে উদ্ঘাটন করেন যার জন্য সোভিয়েত রাশিয়া আর স্তালিনের আমলের সোভিয়েত রাশিয়া থাকবে না।

এই বক্তৃতা যারা শুনছিলেন তাদের অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন, এমনকী ‘Kremlin Hall’থেকে তাদের বের করে আনতে হয়। প্রত্যেকেই হতবাক, কারণ ক্রুশ্চেভ যা বলে চলেছেন তা বলা কোনো ভাবার সাহস পর্যন্ত ছিল না ১৯৫৩ সালের ৫ মার্চের আগে— ওইদিন সোভিয়েত রাশিয়ার একনায়ক স্তালিনের মৃত্যু হয়েছিল।

ক্রুশ্চেভ যা বলছিলেন তার প্রস্তুতি শুরু ১৯৫৫ সালের ৩১ ডিসেম্বরে ‘Pospelov Commission’ তৈরির মাধ্যমে। যার উদ্দেশ্য ১৯৩৪ সালে অনুষ্ঠিত ‘All Union Communist Party (Bolshevik)’-এর ১৭তম পার্টি কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের উপর করা স্তালিনের অত্যাচারের তদন্ত। ১৯৩৪ সালের সভায় যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের বলা হতো ‘the Congress of Victors’, কারণ তারাই সোভিয়েত রাশিয়ায় সোশ্যালিজমের ভিত মজবুত করেছিলেন। কিন্তু তদন্তে উঠে আসলো কী? ১৯৩৭-৩৮ সালে স্তালিনের ‘The Great Purge’ বা শুদ্ধীকরণ অভিযানে ১৯৩৪

সালের প্রতিনিধিদলের ১৯৬৬ জনের মধ্যে ১১০৮ জনকে 'প্রতিবিপ্লবী' (বিপ্লবের বিরোধী) হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, ৮৪৮ জনকে হত্যা করা হয়েছিল আর কেন্দ্রীয় কমিটির ১৩৯ জন সদস্যের মধ্যে ৯৮ জনকে 'গণশত্রু' হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। আর এইসব অভিযুক্তদের বিচার একটাই— গুলি করে হত্যা। এরা সবাই সেই মহান কমিউনিজমের ধ্বজবাহক ছিলেন। স্তালিনের 'পার্জ' চলাকালীন প্রায় ১০ লক্ষ ৫০ হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয় আর প্রায় ৬ লক্ষ ৮০ হাজার ৫০০ জনকে হত্যা করা হয় পার্টি বিরোধী কাজের জন্য! এদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য!

পসপেলভ কমিশনের (Pospelov Commission) এই রিপোর্ট পাওয়ার পরেই ক্রুশ্চেভ সিদ্ধান্ত নেন এই সত্যকে সামনে আনার আর ১৩ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ক্রুশ্চেভ, পসপেলভ, অ্যারিস্টভ আর পার্টির অন্যান্য সদস্যরা এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন -বিয়োজন করেন।

'On the Cult of Personality and its Consequences'- এ ক্রুশ্চেভ স্তালিনের একনায়কতন্ত্রের নিন্দা করে স্তালিনের আমলের নৃশংসতা তথ্য দিয়ে তুলে ধরেন। কিন্তু ক্রুশ্চেভ 'হলোডোমোর', কুলাকদের গণহত্যা নিয়ে চুপ ছিলেন এই বক্তব্যে। শুধুমাত্র স্তালিনের একক সিদ্ধান্তের ফলে পার্টির সদস্যদের উপর যে নৃশংস অত্যাচার করা হয়েছিল সেগুলোই শুধু বলা হয়েছিল--- উদ্দেশ্য ছিল পার্টিতন্ত্রে ব্যক্তিপূজাকে বিলুপ্ত করা বা এমনও হতে পারে স্তালিনের আমলে পার্টির সদস্যদের মধ্যেই যে জীবনের ভীতি সবসময়ই থাকতো তা থেকে তাদের মুক্ত করে জনপ্রিয় হওয়া যা ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার একটা আবশ্যিক শর্ত। ক্রুশ্চেভের প্রতি সন্দেহ এই কারণেই জাগে যে 'পার্জ' চলাকালীন স্তালিনের নির্দেশ অনুযায়ী সে এই হত্যালীলাকে কার্যকর করতে নিজেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল— তা ইচ্ছাকৃত না দায়ে পড়ে তার বিশ্লেষণ হতে পারে।

ক্রুশ্চেভের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, এই 'Secret Speech' সারা বিশ্বের কাছে সোভিয়েত রাশিয়া তথা কমিউনিজমের নৃশংসতার একটা বড়ো লিপিবদ্ধ প্রমাণ আর কমিউনিস্ট শাসনামলে একজন কমিউনিস্ট শাসকের স্বীকৃত প্রমাণ যা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই।

১ মার্চ থেকে এই 'Secret Speech' প্রিন্ট করে পার্টির সমস্ত সভায় পাঠ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এইভাবেই প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষের কাছে এই বক্তব্য খুব অল্প সময়ে পৌঁছে যায়। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায় কমিউনিজমের শেষের দিনগুলোতে সোভিয়েত প্রেস থেকে এই বক্তব্য অফিসিয়ালি প্রকাশিত হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার চিরদিনের শত্রু পোলিশ সরকার এই বক্তব্যকে ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, রেডিয়োতে সম্প্রচার করে। ১৯৫৬ সালের ৫ জুন নিউইয়র্ক টাইমস এই বক্তব্য সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়। সারা বিশ্বে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে পদত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়, হাঙ্গেরিতে স্তালিনের মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার দমনমূলক 'গুলাগ' শ্রমশিবির থেকে বন্দিদের মুক্তি দেওয়া শুরু হয়।

পাশের দেশ চীনে তখন কমিউনিস্ট স্বৈরাচারী মাও-সে-তুং-এর শাসন— সে পার্টির সর্বোচ্চ নেতা। মাও এই 'de-Stalinization'-এর ঘোরতর বিরোধ করলেন, ক্রুশ্চেভকে সংশোধনবাদী হিসেবে নিন্দা করা হলো, সোভিয়েত-চীনের সম্পর্কে চিড় ধরলো। নিজের একনায়কত্ব মজবুত করার চেষ্টায় রত হলেন মাও, এক নতুন ফাঁদ পাতা হলো। চীনে প্রথমে সমালোচকদের উৎসাহ দিতে 'Hundred flowers bloom' নামে ক্যাম্পেন চালিয়ে তাদের মতপ্রকাশে উৎসাহ দেওয়া হয় আর তারপরেই ১৯৫৭ সালে সমালোচকদের উপর নেমে আসে অত্যাচার, যেন স্তালিনের পার্জের চীনা-ভার্সন। এরপরেই চীনের ইতিহাসের নৃশংসতম কালো অধ্যায়ের সূচনা হয় 'The Great Leap Forward' আর 'Cultural Revolution'-এর নামে। পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো মানব নির্মিত দুর্ভিক্ষে কয়েক কোটি মানুষ মারা যায়। একদিকে যখন সোভিয়েত রাশিয়া কমিউনিজমের স্তালিনীয় প্রয়োগ থেকে বেরোতে চাইছে ঠিক তখনই চীন মাওয়ের নেতৃত্বে কমিউনিজমে অন্ধকারে ঢুকছে। ফল দুই ক্ষেত্রেই এক। গণহত্যা, দুর্ভিক্ষ, পার্টি কর্মীদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই, বিশ্বাসহীনতা, দেশের সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের বিপর্যয়।

স্তালিনের মৃত্যুর পরে পরেই ক্ষমতার লড়াই প্রকট হয়ে ওঠে। স্তালিনের হত্যালীলায় সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল NKVD-র প্রধান ল্যাভরেন্টি বেরিয়া (Lavrentiy Beria)। ক্রুশ্চেভ জানতো আগে বেরিয়াকে বাগে আনতে হবে নাহলে স্তালিনের মৃত্যুর পরেও পার্টির নেতৃত্ব থেকে দেশের সাধারণ মানুষ, কারোরই জীবনের প্রতি মুহূর্তের অনিশ্চয়তা কাটবে না। সেনাবাহিনীর প্রধান জর্জি ঝুকভকে নিজের সমর্থনে এনে বেরিয়াকে গ্রেফতার আর তারপর গোপন বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এইভাবেই হঠাৎ অভিযুক্ত করা আর তারপর গোপন বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া— এই খেলা ক্রুশ্চেভ দীর্ঘকাল দেখেছেন, এমনকী বেরিয়াকে সঙ্গে নিয়ে এই খেলায় সক্রিয় অংশগ্রহণও করেছেন।

তাই সবার কাছে বিপজ্জনক বেরিয়াকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা স্তালিনের মৃত্যুর পর থেকেই করেছেন। মালেনকভ, মলোটভদের মতো পুরোনো নেতাদের সরিয়ে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেন ক্রুশ্চেভ পরবর্তীতে কিন্তু স্তালিনের মতো মৃত্যুদণ্ড দেননি। পুরোনো নেতাদের বিচারের নামে হত্যা না করা থেকেই বোঝা যায় ক্রুশ্চেভের 'Secret Speech' সত্যিই স্তালিনের পথ থেকে সোভিয়েত রাশিয়াকে সরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা ছিল। সেই চেষ্টা যে সফল হয়েছিল তার প্রমাণ ক্রুশ্চেভ নিজে। যখন ক্রুশ্চেভের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয় আর ১৯৬৪ সালে ক্রুশ্চেভকে সরতে হয়, তাকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে নির্বাসিত করা হয়েছিল। ক্রুশ্চেভকে প্রচার মাধ্যম থেকে দূরে রাখা হয় কিন্তু তার গোপন কথা রেকর্ড করে KGB-র চোখে ধুলো দিয়ে দেশের বাইরে পাঠান ক্রুশ্চেভ। সেই স্মৃতিচারণ

গুলাগ লেবার ক্যাম্প

থেকে পার্জের সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জীবন কিরকম অনিশ্চিত ছিল, কীভাবে স্তালিনের মনে হওয়া সন্দেহের ভিত্তিতে তাদের জীবনের ইতি হতো তার প্রচুর ঘটনা জানা যায়। ক্রুশ্চেভের স্মৃতিচারণ 'Khrushchev Remembers'-এর 'The Terror' অধ্যায়ের একটি অংশ থেকে কমিউনিস্টদের আরাধ্য স্তালিনের চরিত্র আর কমিউনিস্ট শাসন সম্পর্কে ধারণা করা যায়—

''পরে, সেন্ট্রাল কমিটির একদিনব্যাপী বৈঠক শেষ হওয়ার পর সবাই রাতের খাবারের জন্য ছড়িয়ে পড়ল। আমি কিছুক্ষণ সেখানে থেকে গেলাম। যখন আমি উঠছিলাম যাওয়ার জন্য, হঠাৎ জোসেফ স্তালিন আমাকে চিৎকার করে বললেন, 'ক্রুশ্চেভ, তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

আমি বললাম, 'আমি রাতের খাবার খেতে যাচ্ছি।'

'আমার সঙ্গে চলো। আমরা একসঙ্গে খাব।'

আমি মনে মনে ভাবলাম, 'তিনি আমাকে হঠাৎ করে কেন তাঁর সঙ্গে খেতে ডাকছেন?' আমরা যখন বের হচ্ছিলাম, তখন ইয়াকভ আরকাদিয়েভিচ ইয়াকোভলেভ, যিনি কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছিলেন, তিনি বিনা নিমন্ত্রণে স্তালিনের সঙ্গে তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে চলে এলেন। আমরা তিনজন একসঙ্গে রাতের খাবার খেলাম। বেশিরভাগ সময় স্তালিনই কথা বলছিলেন।

এপস্টাইন-ইয়াকোভলেভ (ইয়াকভ ইয়াকোভলেভ-এর আসল নাম—এপস্টাইন-ইয়াকোভলেভ।) খুবই অস্থির অবস্থায় ছিলেন। দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড মানসিক অশান্তির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ভয় পাচ্ছিলেন যে তাঁকে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হবে। তাঁর এই আশঙ্কা ভুল ছিল না। স্তালিনের সঙ্গে এই বন্ধুত্বপূর্ণ রাতের খাবারের কিছুদিন পরেই ইয়াকোভলেভকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

আমি এই ঘটনাটি বলছি এটা বোঝানোর জন্য যে, স্তালিনের এত ঘনিষ্ঠ একজন মানুষ; যেমন ইয়াকোভলেভ, যিনি সেন্ট্রাল কমিটির কৃষি বিভাগের প্রধান ছিলেন এবং বিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে স্তালিনের অন্যতম বিশ্বস্ত সমর্থক ছিলেন; তাঁর জীবনও হঠাৎ করে এক সুতোয় ঝুলে যেতে পারত।''

এই ঘটনাটি স্তালিনের বিশ্বাসঘাতক স্বভাবের একটি উদাহরণ।

নিজের 'Secret Speech'-এ যেভাবে স্তালিনের পাশবিকতা আর বিশ্বাসঘাতকতা তুলে ধরেছিলেন ক্রুশ্চেভ, নিজের নির্বাসিত জীবনেও সেই জায়গায় ছিলেন।

সমস্যা শুধু স্তালিনের একনায়কতন্ত্রে ছিল না, ছিল কমিউনিজমের মূলেই। তা নাহলে ক্রুশ্চেভকে কেন এভাবে সরতে হবে? কেন ক্ষমতার শীর্ষে উঠতে বিশ্বাসঘাতকতা আর ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিতে হবে? স্তালিনের পথ থেকে সোভিয়েত রাশিয়াকে সরাতে গিয়ে ক্রুশ্চেভ নিজেও কি ষড়যন্ত্র করেননি?

পৃথিবীর সর্বত্র কমিউনিজমের একই চিত্র! কিন্তু ক্রুশ্চেভ পৃথিবীকে যা দিয়ে গেলেন তা হলো স্তালিনের নৃশংসতার প্রমাণ যার ফলে 'Secret Speech'- এর পরবর্তী পৃথিবী সেই গণহত্যাকারীর ব্যক্তিপূজা থেকে বের হওয়ার রসদ পেয়েছে।

ভাবতেও অবাক লাগে ভারতের মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশেও সেই গণ-হত্যাকারীকে সামনে রেখেও রাজনীতি করা যায় !

এর কারণ বোধ হয় 'ইতিহাস জ্ঞান', যার অভাবে ক্রুশ্চেভের 'Secret Speech' আজও 'Secret' হয়েই আছে! □

# রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে নৈরাজ্যের অবসান কাম্য

**বিশ্বপ্রিয় দাস**

রাজ্যের রাজনীতিতে এখন একটা দিশেহারা ভাব। রাজ্যের শাসক দল এখন ছন্নছাড়া। যতই বড়াই করে জাহির করে বলুক, আমরা ২২৬টা আসন জিতব। একটা প্রশ্ন সবার মনেই জাগতে শুরু করেছে যে, এটা কি এখনও বলা সাজে? তিনিই এতটাই হারের চিন্তায় আতঙ্কিত যে প্রকাশ্য সভায় বেসামাল বকতে শুরু করেছেন। অশ্লীল ভাষা ব্যবহারেও পিছপা হচ্ছেন না।

তিনি বহুল প্রচলিত একটি কথ্য 'কটু' কথা প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলতেও ছাড়ছেন না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে নিয়ে কটূক্তির কথা না হয় নাই-বা বললাম। সম্প্রতি তিনি এতটাই উদ্ধত যে ভারতীয় আধা সামরিক বাহিনী, যারা আমাদের জীবন ও দেশকে রক্ষা করে চলেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য করে প্রকাশ্যে, নির্বাচনী জনসভায় বলেছেন যে তাঁরা এই পশ্চিমবঙ্গ দখল করতে আসছে। এমনকী তিনি এটা বলতে গিয়েও জিভে কামড় খাননি যে এই বাহিনী পশ্চিমবঙ্গের নারীদের সম্ভ্রমে আঘাত হানতে আসছে। এই উসকানি সাধারণ, সরল সাধাসিধে মানুষগুলোকে একদিকে যেমন বিভ্রান্ত করছে, অন্যদিকে এইসব উসকানিমূলক কথায় ভারতের রক্ষাকারী সেনাদের প্রতি সাধারণকে উসকানি দিয়ে একটা আঘাত হানার দিকে প্রকারান্তরে ঠেলে দিচ্ছেন। তিনি ভারতের একটি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান।

তিনি হয়তো দেশের বিরুদ্ধে গিয়ে একটা অন্যরকম পরিবেশ তৈরি করতে চাইছেন। আর চাইছেন পশ্চিমবঙ্গে গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দিয়ে নিজের ও নিজের পরিবারের লোভের যে স্বার্থ তিনি এই ১৫ বছর ধরে রক্ষা করছেন, সেখানে সাধারণ মানুষের বলি চড়াতেও পিছপা হচ্ছে না তাঁর বিষাক্ত মন। আসা যাক, এবারের ২০২৬-এর নির্বাচনের কথায়। দলের সুপ্রিমোর প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে, উপযুক্ত ভালো প্রার্থী খুঁজে না পাওয়া। তা না হলে বহু প্রার্থী এমন আছেন, যাঁদের গায়ে নানা দুর্নীতির পাঁকে ঢাকা আছে। তাদের অনেকে স্বীয় অপরাধের জন্য জেলও খেটেছেন। তারা এবার স্বমহিমায় ভোটের ময়দানে নেমে পড়ায় দলের ভিতরে অনেক কর্মী মেনে নিতে পারছেন না, কেউ প্রকাশ্যে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করছেন, কেউ আবার আড়ালে-আবডালে কঠোর সমালোচনা করছেন। তাদের কথায়, যাঁদের জন্য দলের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলো, যাদের জন্য দলের ন্যূনতম সম্মানটুকুও অবশিষ্ট নেই, তাদের আবার নির্বাচনের ময়দানে সুযোগ দেওয়া কি সুপ্রিমো উচিত কাজ করলেন? এই প্রশ্নও তুলছেন রাজ্যের শাসক দলের একাংশ। এদিকে এবার বেশ কিছু প্রার্থীর ক্ষেত্রে ছাঁটাই হয়েছেন বহু পুরনো বিধায়ক। কেউ তাঁদের মধ্যে বাতিল হবার পর রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার কথা বলেছেন, কেউ আবার এই প্রার্থীপদ টাকার বিনিময়ে বিক্রির অভিযোগ এনেছেন। যদি তাদের কথাই সত্য হয়, তাহলে একটি আনুমানিক হিসেব করছেন সাধারণ মানুষ। তাদের হিসেবটি এই রকম, যদি ২৯৪টি আসনের মধ্যে ২০০টি আসন টাকার নিলামে বণ্টিত হয়। ন্যূনতম ২ কোটি টাকা যদি মূল্যমান হয়। তাহলে এক ধাক্কায় ভোটের আগেই আয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ৪০০ কোটি টাকা। এবার আছে দাঁড়াবার পর দেওয়া টাকার অঙ্ক। সেটাও কম নয়। এখানেও একটা আনুমানিক হিসেব করেছেন তারা, সেটাও কম নয়। প্রায় ৬০০ কোটি টাকা। ফলে যদি নির্বাচনে ভরাডুবিও হয় দল, সেক্ষেত্রে একটা ১০০০ কোটি টাকার ফাটকা ফান্ড এসে গেল দলের কাছে। দলের মধ্যে থাকা একটি বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী বলছে, এই টাকার সিংহভাগ কিন্তু একটি বিশেষভাবে হস্তান্তরিত হবে। যেখানে দলের কোনো যোগাযোগ নেই। কেননা এই টাকার সবটাই অলিখিত। ফলে যতটুকু একটি বিশেষ সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে যে, ইতিমধ্যেই এই টাকা নিয়ে কী হবে, তা দলের মধ্যে থাকবে, নাকি বিশেষ কারোর কাছে চলে যাবে, সেটাও আলোচনা চলছে।

রাজ্যে এখন পরিবর্তনের হাওয়া চলছে। সেটি আগামী কয়েক দিনে প্রবল সাইক্লোনে পরিণত হবে। এবারে রাজ্যে শাসন ক্ষমতা কার হাতে যাবে, সেটা সাধারণ মানুষ ইতিমধ্যেই ভেবে নিয়েছেন। তাঁরা একটি সুস্থ ও জাতীয়তাবাদী দলকেই সমর্থন জানাতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। যে দলটি এর মধ্যেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ন্যায়ের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। এই ব্যবস্থাকে শ্রীরামের জনকল্যাণ শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনীয়। যেখানে ধর্মীয় বিভেদ নেই। আছে মানুষের নিজের শাসন ব্যবস্থা। যা কিনা জনগণের জন্য। যে শাসন ব্যবস্থায় দুর্নীতির, চুরির, মিথ্যার কোনো স্থান নেই। আছে শুধু মানুষের জন্য একটি সুশাসন ব্যবস্থা। যেখানে প্রতিটি মানুষ পাবেন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের জন্য নিজের অধিকারের সুযোগ। পাবেন নিজের সন্তানের জন্য কাজের সুযোগ। পাবেন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ন্যায় বিচারের সুযোগ। তাই মানুষ প্রস্তুতি নিয়েই নিয়েছেন দীর্ঘ ১৫ বছরের স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে একটি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার। □

## শ্রমিকের মুখে হাসি—ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রবাদী কেন্দ্রীয় সরকারের মানবিক মুখ উজ্জ্বল

২০২৬ সালের ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন ন্যূনতম মজুরি কাঠামোকে ঘিরে শ্রমিক মহলে ইতিবাচক সাড়া পড়েছে। এই সিদ্ধান্তকে শ্রমিক স্বার্থে এক মানবিক ও দূরদর্শী পদক্ষেপ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ। সংগঠনের মতে, রাষ্ট্রবাদী কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগ শুধু অর্থনৈতিক নয়, বরং শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়নের প্রতি এক আন্তরিক দায়বদ্ধতার পরিচয় বহন করে।

নতুন মজুরি কাঠামোয় অদক্ষ থেকে অতিদক্ষ--- সব ধরনের কর্মীদের জন্য পৃথকভাবে দৈনিক ও মাসিক ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে সংগঠিত ও অসংগঠিত উভয় ক্ষেত্রের শ্রমিকদের আর্থিক নিরাপত্তা আরও সুসংহত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। শ্রম দপ্তরের এই সিদ্ধান্তে স্পষ্ট হয়েছে, সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত বিষয়গুলিতে সরকার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এগোচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা অরুণাভ পোদ্দার বলেন, 'রাষ্ট্রবাদী কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপে শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হয়েছে। এটি সরকারের মানবিক ও সংবেদনশীল মানসিকতার প্রতিফলন, যা শ্রমিকদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।'

আর এক শ্রমিক নেতা সমীর মণ্ডল তাঁর বক্তব্যে জানান, 'শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার যে শ্রমজীবী মানুষের পাশে রয়েছে, এই উদ্যোগ তারই প্রমাণ।' পোস্টাল ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, 'এটি শুধু একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং শ্রমিকদের প্রতি সরকারের দায়িত্ববোধ ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের শ্রমিকদের জন্য এটি বড়ো স্বস্তির খবর।'

অন্যদিকে, শ্রমিক নেতা জয় চক্রবর্তী উল্লেখ করেন, 'এই ন্যূনতম মজুরি কাঠামো শ্রকিদের জীবনযাত্রায় বাস্তব পরিবর্তন আনবে। কেন্দ্রের এই উদ্যোগ শ্রমিকবান্ধব নীতির এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে থাকবে। সামগ্রিকভাবে, কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত সরকার পরিচালনায় মানবিকতা ও দায়িত্বশীলতার এক স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে। ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের দীর্ঘদিনের দাবিকে মর্যাদা দিয়ে এই পদক্ষেপ ভবিষ্যতে শ্রমিক কল্যাণে আরও ইতিবাচক পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

**—কুন্তল চক্রবর্তী,**
কলেজ রোড, বনগাঁ, উ: ২৪ পরগনা।

## ভোট দেওয়ার আগে একটু ভাবুন

ভারতের একটি অঙ্গ রাজ্য হলো পশ্চিমবঙ্গ। বাকি রাজ্য যখন বিকশিত ভারতের দিকে এগুচ্ছে, তখন পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক, সামাজিক পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। এমনকী কিছু জেলার ভৌগোলিক জনবিন্যাস পরিবর্তন হয়েছে। সীমান্ত লাগোয়া মালদা, মুর্শিদাবাদ, দুই চব্বিশ পরগনার মতো জেলাগুলোতে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা ঘটেগিয়েছে। অন্যদিকে ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু সংখ্যা ৮০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৭০ শতাংশ হয়ে গেছে। তার মানে পশ্চিমবঙ্গেও হিন্দু জনসংখ্যা ১২.৫ শতাংশ কমে গেছে। এর ফলে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে নিরীহ মানুষের কেবল হিন্দু হওয়ার কারণে প্রাণ দিতে হলো। রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার জন্য ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তে জমি অধিগ্রহণ করে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। অনুপ্রবেশের ফলে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে দেশবিরোধী, সমাজ বিরোধী দৌরাত্ম্য বেড়েছে। দেশের নিরাপত্তা ও নাগরিক স্বার্থ সুরক্ষিত করতে প্রয়োজন সুশাসন। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দোষীর ধর্ম বা রাজনৈতিক পরিচয় নয়, অপরাধ হবে বিচারের মাপকাঠি। পশ্চিমবঙ্গে নারী সুরক্ষিত নয়। মা ও বোনেদের জন্যে নিরাপদ শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বাঙ্গালি হিন্দুদের জীবন, সম্পত্তি ও সাংস্কৃতিক অধিকার সুরক্ষিত হওয়া চাই। ভয় নয়, নিজের রাজ্যে মাথা উঁচু করে বাঁচা ও ধর্মাচরণের যে অধিকার সংবিধান দিয়েছে, তার সম্মান দিতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে রাজনীতি ও দুর্নীতি মুক্ত করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার মান অনেকটা নীচে নেমে গেছে। সর্বস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয় নীতির অনুসারী এবং জাতীয় স্তরে উন্নীত করতে হবে।

এবারের ভোটের লড়াই দুর্নীতি বনাম স্বচ্ছ প্রশাসন। শোষণ বনাম উন্নয়ন। জেহাদি মোল্লাবাদী বনাম জাতীয়তাবোধ। দেশবিরোধী বনাম দেশপ্রেম। ভোটারদের আজকের সিদ্ধান্ত কয়েক প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। সুতরাং ভেবেচিন্তে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা উচিত।

**—চিত্তরঞ্জন মান্না,**
চন্দ্রকোণা রোড, পশ্চিম মেদিনীপুর।

## ভারতের চলমান নির্বাচন-বিধির কিছু পরিবর্তন ও সংযোজনের প্রস্তাব

আমরা জানি আমাদের মাতৃভূমি ভারত বর্তমানে আর্থিক-সমৃদ্ধি ও প্রতিরক্ষার নিরিখে বিশ্বের চতুর্থ শক্তি তো বটেই; অচিরেই তৃতীয় শক্তিধর হওয়ার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। অথচ দুঃখের বিষয় এই যে, দেশের এক শ্রেণীর ইচ্ছাকৃতভাবে অলসতাবশত তাঁরা তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন না। যাঁরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন না— তাঁদের দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। এক, যাঁরা উচ্চবিত্তশালী এলিট

ফঃ ৩

সম্প্রদায়, যাঁরা লাইনে দাঁড়িয়ে 'সময় নষ্ট করে' ভোটাধিকার প্রয়োগ করাকে 'ম্যাটার অফ প্রসেস' মনে করেন। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হলেন তাঁরা— যাঁরা তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে অসচেতন।

আমরা ভারতের খাবো, ভারতের পরবো, ভারত সরকারের ঘোষিত সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবো, ভারতেই বংশানুক্রমে বসবাস করবো, অথচ এই ভারতভূমিকে কারা শাসন করবেন— সে ব্যাপারে আমার কোনো ভূমিকা থাকবে না; —এই ধরনের মানসিকতা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

কিছুদিন আগে মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের এমএলএ হুমায়ুন কবীর মিডিয়ায় সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে একটি অকাট্য সত্যিকথা বলেছিলেন, 'ভোটের দিন অধিকাংশ হিন্দু মাছ-মাংস দিয়ে ভাত খেয়ে আরাম করে ঘুমোয়, আর মুসলমানদের ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ লাইনে দাঁড়িয়ে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে।' কথাটি সত্যি হলেও তাঁদের ওই প্রকারের ভোটদান কিন্তু ভারতভূমিকে ভালোবেসে নয়; তাঁদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় কোনো একটি 'বিশেষ তোষণকারী' দলকে ক্ষমতাসীন করার লক্ষ্যে।

এবার আমার প্রস্তাবগুলি হলো— এক, যেসব ভোটদাতা (লোকসভা, বিধানসভা, পৌরসভা বা পঞ্চায়েত) পর পর দু'বার তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকবেন, তাঁদের 'কালো তালিকাভুক্ত' করে ভোটার লিস্টে তাঁদের চিহ্নিত করার জন্য তাঁদের নামের পাশে কোনো বিশেষ চিহ্ন দ্বারা তাঁদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হোক। তারপরেও যদি তাঁরা সচেতন না হন তাহলে সরকারের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হোক এবং ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেবার ব্যবস্থা করা হোক। অবশ্য অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, দিব্যাঙ্গ ও রুগ্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে উল্লিখিত নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

দুই, পঞ্চায়েত থেকে লোকসভা নির্বাচনে কোনো ব্যক্তি কোনো অবস্থাতেই একাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। ধরা যাক, কোনো ব্যক্তি দু'টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দু'টিতেই তিনি জয়লাভ করলেন। তখন একটি আসন থেকে তাঁকে পদত্যাগ করতেই হবে। ফলে সেই আসনটিতে উপনির্বাচন অবশ্যম্ভাবী। আর উপনির্বাচন মানেই কোটি কোটি টাকার অপচয়ই শুধু নয়; 'আদর্শ নির্বাচন আচরণ বিধি'র গেরোয় সংশ্লিষ্ট আসনে প্রায় দু'মাস যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ থাকা, বেশ কিছু শ্রমদিবস নষ্ট হওয়া এবং প্রশাসনের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি কারণে দেশের ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছুই নেই।

তিন, পঞ্চায়েত সদস্য থেকে সংসদ-সদস্যরা ইদানীং পুতুল খেলার মতো হামেশাই দল বদল করেন। অবশ্য তা তাঁরা করতেই পারেন। গণতন্ত্র সে অধিকার তাঁদের দিয়েছে। কিন্তু ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ ভোটদাতার রাজনৈতিক মতাদর্শকে জলাঞ্জলি দেবার অধিকার তাঁদের নিশ্চয়ই দেওয়া হয়নি। ইচ্ছা হলে কেউ দলবদল করতেই পারেন, তবে সংশ্লিষ্ট পদে পদাসীন থেকে নয়; পদত্যাগ করার পর। জানি, দলত্যাগ বিরোধী আইন আছে এবং সংশ্লিষ্ট স্পিকার মহোদয়কে সে ব্যাপারে যথেষ্ট ক্ষমতাও দেওয়া আছে। কিন্তু তার প্রয়োগ কোথায়? উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন-প্রণেতাদের ভেবে দেখার অনুরোধ রইল।

**—বিনয়কৃষ্ণ দাশ,**
উত্তমাশা, বালুরঘাট।

## নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা

নৈতিক শব্দটি নীতি থেকে এসেছে। আর আধ্যাত্মিক শব্দটি আত্মা থেকে এসেছে। নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা একে অপরের পরিপূরক। ভারতবর্ষকে দেবভূমি বলা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, যদি এই পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ থাকে যাকে পুণ্যভূমি নামে বিশেষিত করা যেতে পারে, দয়া, পবিত্রতা এবং যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতার বিকাশ হয়েছে সে আমাদের মাতৃভূমি এই ভারতবর্ষ। পাশ্চাত্য জগৎ যখন দেহ-মন-বুদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে তখন ভারতবর্ষের মুনি ঋষিরা ভারতবর্ষের মানুষ তথা বিশ্ববাসীকে শরীর মন-দেহ বুদ্ধির পরে আরেকটি বস্তুর অস্তিত্বের কথা প্রকাশ করেছেন, সেটি হচ্ছে আত্মা। এই আত্মা হলো অবিনশ্বর সত্তা। এই আত্মার জাগরণই হলো আধ্যাত্মিকতা। হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা বিকাশ লাভ করেছে। হিন্দুধর্মের এই ভাবনা অনুসারে সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ তৈরির প্রচেষ্টা প্রাচীনকাল থেকেই দেখতে পাওয়া যায়।

তাঁরা মানুষের জীবনকে ভাগ করেছেন চারটি পর্যায়ে— ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। হিন্দু সংস্কৃতি বলেছে, তোমার ভেতরের আত্মাকে ভগবান বলে জানো এবং অন্য সকলের আত্মার সঙ্গে একাত্ম অনুভব করো। এই হলো একাত্মতা। আর যা জানো সেই জ্ঞানে জীবনযাপন করো। ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভগবৎ তুল্য হও। হিন্দু সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক সাধনার ফল এই সংস্কৃতিতে প্রতিটি মানুষের জীবন নদীর মতো সমুদ্ররূপী ঈশ্বরের মিলিত হওয়ার মধ্যেই আছে। তার সর্বব্যাপী সর্বাঙ্গীণ সাধনা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান মনুষ্যত্বে। প্রতিটি ব্যক্তির দেহ-মন-বুদ্ধি-আত্মা আছে আর প্রয়োজনে মানুষ একটির কল্যাণে অপরটিকে উপেক্ষা করে। যেমন আত্মার জন্য দেহকে। প্রত্যেক দেশেরও তেমন দেহ-মন-বুদ্ধি-আত্মা আছে। ব্যক্তির চারটি সত্তার পূর্ণতা বিকাশের নামই হচ্ছে মনুষ্যত্ব। তেমনি দেশের চারটি পূর্ণ বিকাশের নামই কল্যাণকারী দেশ। সব দেশ যখন সম্পূর্ণভাবে একই উদ্দেশ্যমুখী হয় তখনই বিশ্বের বৈভবময় রূপ প্রকট হয়।

**—তন্ময় পণ্ডিত,**
কাঞ্চনতার, মালদহ।

*With Best Compliments from -*

**A**

**Well Wisher**

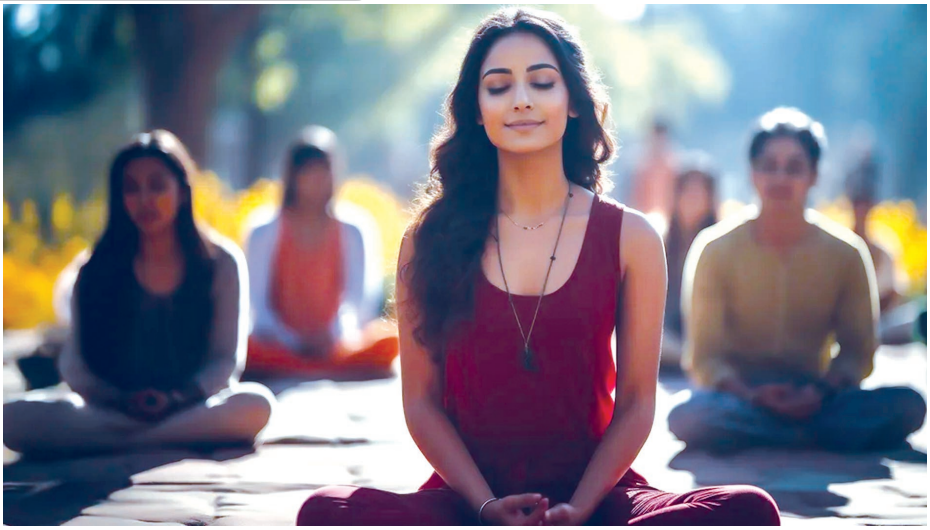

# মায়েদেরও জীবনীশক্তির জন্য ধ্যান অত্যন্ত জরুরি

**মৌ চৌধুরী**

প্রথমেই অনুরোধ করি আমাদের বর্তমান যুগের আধুনিক মায়েদের কাছে তারা যেন নিজেদের শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখেন যাতে সুস্থ সুন্দর নিজেও থাকতে পারেন এবং সমাজের বুকে সুস্থ সুন্দর সন্তানের জন্ম দিতে পারেন। এই সংকল্প ব্রত সংসার জীবনে শরীর ও মনকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করবে। বর্তমান যুগে যে টেনশন সেগুলোকে অতিক্রম করার জন্য কিছু নিয়ম পালন করা খুবই জরুরি। আজকের দিনে জীবন যুদ্ধে সবাই বড়োই ক্লান্ত।

মহিলাদেরও বর্তমানে নানা রকম দৈনন্দিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ট্রেসের দরুন মানুষের মধ্যে নানা ধরনের রোগ বাসা বাঁধছে। অনেক সময় পরীক্ষা করে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধপত্র খেয়ে বিশেষ কিছু উপকার হচ্ছে না। জীবনীশক্তি হারিয়ে গেলে ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে যায়। শরীর ও মনে এর প্রভাব পড়ে। মেডিটেশন বা ধ্যান হলো এমন একটি উপায় যা শরীর ও মনকে সুস্থ রাখে, অযথা চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আর এই ধ্যান করার জন্য একাগ্রতার সঙ্গে মনকে শান্ত করতে হয়।

প্রথম প্রথম অসীম ধৈর্য ও প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে নিজেকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসতে হয়। অবিরাম মোহ, বাসনা-কামনা, অহমিকা, ভয়-ভীতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে শত যোজন দূরে নিজের মনকে সরিয়ে নিতে হবে। অতিরিক্ত মানসিক অস্থিরতা মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে নিতে যেতে পারে। কিছুটা সময় মন স্থির করে নিয়মিত ধ্যান বা যোগ অভ্যাস করতে পারলে মনে অনাবিল আনন্দ ও শান্তি খুঁজে পাওয়া যায়। সাকার বা নিরাকার যেভাবে অভ্যাস করা হোক না, কেন মানুষ তখন নিজেকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারে। প্রত্যেকটা মানুষই যদি নিজেকে কিছুটা সময় একান্তভাবে দেয় তবে পরিস্থিতি বাইরে যাবে না। নিত্যদিনের টানাপোড়েনে যখন মাথা গরম হয়ে যায়, তখন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। এই মেডিটেশন প্রথম দিকে অভ্যাস করতে গেলে কিছুটা অসুবিধা হতে পারে কিন্তু কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে প্রশিক্ষণ নিলে ধীরে ধীরে নিজেই অভ্যাস করা যেতে পারে।

একজন শান্ত সৌম্য প্রকৃতির মানুষ প্রচুর জীবনীশক্তির অধিকারী হন। তারা সৎ চিন্তা ভাবনায় সুস্থ রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনে এবং সামাজিক- পারিবারিক সমস্ত দায়দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে। মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ওষুধ নয়, ধ্যানের গুরুত্ব অপরিসীম। বেশি জটিলতায় না গিয়ে প্রথমে শবাসন করে মনকে শান্ত করে নিয়ে তারপর ধ্যান করলে ধীরে ধীরে মহাজাগতিক শক্তি তার মধ্যে প্রবেশ করে। চোখ বন্ধ অবস্থায় স্থির হয়ে বসে মনকে একদম শূন্য করে দিয়ে নিজের মধ্যে পরমানন্দ অনুভব করতে হবে। যে কোনো দেবদেবীর ছবি হোক কিংবা ওঙ্কারকে মনের মধ্যে প্রতিস্থাপন করে হৃদয়ের জ্যোতিকে প্রজ্বলিত করতে পারলে মন শান্ত হবে, শরীর সুস্থ ও সবল হবে।

মনের আনন্দ জীবনীশক্তির উৎস। তারপরে তো রয়েছে খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম, হাঁটা, তাতে মন শান্ত হবে এবং মন নিয়ন্ত্রণে থাকবে। মেডিটেশন সবচেয়ে বেশি উপকারী মহৌষধ প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে। নিয়মিত অভ্যাসে এর উপকারিতা সবচেয়ে বেশি। মনের ভেতর যে জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলে সেটাকে নির্মল শান্ত সুন্দর করে তোলে। আত্মবিশ্বাস আর সময়কে গুরুত্ব দিতে হবে। একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষ সময়কে ব্যবহার করতে জানেন। সময়ের সদ্ব্যবহার জীবনের একটা বড়ো অঙ্গ— এটাকে ভুলে গেলে চলবে না। সময় চাকার মতো পরিবর্তিত হয়। ভালো সময়, মন্দ সময় সবকিছুকে সমানভাবে মেনে নিতে হবে। জীবনে সবকিছুর দরকার রয়েছে। বিজ্ঞানী ডারউইনের ভাষায় বলা যায়, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে যে পারে সেই বেঁচে থাকে। নিজেকে সব পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত রাখার জন্যই এই মেডিটেশন। □

# গরমে পুষ্টিচাহিদা মেটাতে খাদ্যের পরিবর্তন প্রয়োজন

**ডাঃ প্রকাশ মল্লিক**

আমাদের পুষ্টি চাহিদার বিষয়ে সব মরসুমেই সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। গ্রীষ্মের গরমে এই সতর্কতা আরও বেড়ে যায়। এ সময় উচ্চ তাপমাত্রায় তৈরি খাবার গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের সচেতনতা বাড়াতে হবে। কোন খাবার তালিকা থেকে এ সময় কমিয়ে দিতে হবে অথবা কোন খাবার একেবারেই খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে তা জানতে হবে। এসবগুলো না জানলে অসাবধান বা অসচেতনতার কারণে খাদ্য সম্পর্কিত দীর্ঘমেয়াদি কিছু রোগ সৃষ্টি হয়। যেমন— শরীরের অতিরিক্ত ওজন, ডায়াবেটিস, ইনসুলিন রেজিসটেন্স, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ। কোনো ব্যক্তি যদি উপরোক্ত যে কোনো একটি বা সবগুলোতে ইতিমধ্যে আক্রান্ত হন তবে তাঁকে এই গরমে স্বস্তির জন্য সজাগ থাকতে হবে, কেননা প্রচণ্ড গরমে শরীরের মধ্যে বিভিন্ন পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন— দেহে সোডিয়াম ও পটাশিয়াম কমে যাওয়া, বমি হওয়া, খাদ্য হজম না হওয়া ও পেট ফাঁপা, ডায়ারিয়া, আমাশয়, জ্বর।

শারীরিক এই পরিবর্তনগুলি প্রতিরোধ করতে খাদ্য নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। গরমে সঠিক পুষ্টির লক্ষ্যে সুস্বাস্থ্য রক্ষায় যে দিকগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে তা হলো : প্রথম ও প্রধান সাবধানতা বাইরের খোলা জায়গার জল, শরবত, শাকসবজি ও ফল খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। ডাব, তরমুজ, বাঙি, বেলের শরবৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে হাত ধুয়ে খাবারের উপযোগী করে নিয়ে খেতে হবে। গরমে মাছ, মাংস, ভুনা, ভাজি, খিচুড়ি, পোলাও, ফাস্টফুড খাওয়া কমিয়ে আম-ডাল, পাতলা দুধ, টক দই, করলার তরকারি, লেবু চিনির শরবত, স্যালাড, রসাল ফল খাওয়া যেতে পারে। যাঁরা নিয়মিত হাঁটেন, তাঁরা শুধু সময় পরিবর্তন করলেই চলবে। যেমন সকালে না হেঁটে বিকাল বা সন্ধ্যার পর হাঁটা আরামদায়ক।

গরমে খুব বেশি হাঁটা, অত্যধিক ব্যায়াম, পরিশ্রম, অত্যধিক খাদ্য গ্রহণ পরিহার করুন। ওজন কমানোর জন্য গরমকাল সহায়ক। আপনি যদি উচ্চ ক্যালোরি পরিহার করে নিম্ন ক্যালোরির খাদ্য গ্রহণ করুন তবে ওজন কমবে। নিম্ন ক্যালোরি খাবারের মধ্যে (যেমন— তরমুজ, জাম, জামরুল, ডাব ইত্যাদি) ও সবজি (যেমন— লাউ, পেঁপে, ঝিঙা, কুমড়া প্রভৃতি) গ্রহণ করতে হবে। গরমে খাদ্য তালিকায় তেল ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্তক হোন। গরমে তেলের ব্যবহার কমিয়ে দিন। ১ গ্রাম তেল শরীরে ৯ কিলো ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন করে। উচ্চ তাপমাত্রায় ও আর্দ্রতায় শরীরের তাপ বাইরে বেরোতে পারে না। ফলে শরীরের তাপমাত্রা বাড়ে। এই গরমে বয়স্ক ও অতিরিক্ত ওজনধারী ব্যক্তিদের হিট স্ট্রোকের আশঙ্কা বাড়ে। এই গরমে তেলের ব্যবহার কমালে আপনার তিনটি উপকার নিশ্চিত হবে। কম তেলের খাবার খেয়ে আপনি স্বস্তিবোধ করবেন, হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি কমবে। ইদানীং কোলেস্টেরল ফ্রি তেলের প্রচার বেড়েছে। উদ্ভিদ উৎস থেকে আসা তেলে প্রকৃতিগতভাবেই কোনো কোলেস্টেরল থাকে না। উদ্ভিজ্জ তেলকে কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে কোলেস্টেরল ফ্রি করা হয়নি। ১ চা চামচ (৫ এম এল) সয়াবিন তেল ৪৫ ক্যালোরি, কোলেস্টেরল ফ্রি হোক বা না হোক ৫ এম এল তেল বা ঘিয়ের ক্যালোরি মূল্য কিন্তু একই। তেল অতিরিক্ত গ্রহণের ফলে আপনার শরীরের ওজন বৃদ্ধি পাবে যা হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়াবে। ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি তো রয়েছেই। প্রতিদিন একজন প্রাপ্ত বয়স্কের ২০ গ্রাম ভেজিটেবিল ফ্যাট, গর্ভবতী মহিলার ক্ষেত্রে ৩০ গ্রাম ভেজিটেবিল ফ্যাট, দুগ্ধদানকারী মায়ের ৪৫ গ্রাম ভেজিটেবিল ফ্যাট প্রয়োজন। এই গরমে এখনই নিয়ন্ত্রণ করুন অতিরিক্ত তেল গ্রহণ, ডুবো তেলে ভাজা খাবার, ঘি, মাখন, পনির, ফাস্টফুড, কোল্ড ড্রিংকস, পোলাও, মাংস প্রভৃতি; অতিরিক্ত মিষ্টি খাবার, অতিরিক্ত গরম বা ঠাণ্ডা খাবার।

প্রতিদিন তিনটের বেশি তরকারি গ্রহণ করবেন না। কারণ খাদ্য তালিকায় রান্না করা খাবার যত বাড়াবেন তত বেশি তেল খাওয়া হবে, তত বেশি পেট ভরে খাওয়া হবে। তাই সাদা ভাতের সঙ্গে করলা ভাজা, পাতলা আম-ডাল ও মাছ বা মুরগির ঝোল তরকারি খাওয়া যথেষ্ট। স্যালাড, লেবু রসালো ফল ও টক দই সঙ্গে রাখতে পারেন। তাজা খাবার গ্রহণ করুন, বাসি খাবার পরিহার করুন। কোমল পানীয়ের পরিবর্তে ডাবের জল গ্রহণ করুন। ফ্রিজের ঠাণ্ডা তরল খাবেন না। এতে গরমে অস্বস্তি আরও বাড়বে। তরমুজের শরবত পান করুন।

শরীরে প্রোটিনের চাহিদা গুরুত্বপূর্ণ। ৬০ কেজি শরীরের ওজনের জন্য ৬০ গ্রাম প্রোটিন প্রয়োজন (কিডনি রোগ ব্যতীত) গরমে মাংস পরিহার করে এর পরিবর্তে ছোটো মাছ, পাতলা ডাল, টক দই, পাতলা দুধ অন্তর্ভুক্ত করুন। শরীরে শর্করা জাতীয় খাবারের চাহিদা মোট ক্যালোরির ৬০ শতাংশ অর্থাৎ আপনার ওজন, উচ্চতা, বয়স, শারীরিক পরিশ্রম, লিঙ্গভেদে শক্তি চাহিদা যদি হয় ২০০০ ক্যালোরি তবে তার ৬০ শতাংশ নিতে হবে শর্করা জাতীয় খাবার থেকে। অর্থাৎ ১২০০ ক্যালোরি। এটি আপনি পাবেন ভাত, রুটি, চিঁড়া, মুড়ি, সুজি, সাগু, চিনি, আলু ও ফল থেকে। দুধ থেকেও আপনি শর্করা পাবেন। ফলে গড়ে ১৫ শতাংশ শর্করা থাকে। দুধে ১২ শতাংশ। আমে প্রোটিন বা ফ্যাট নেই। পুরোটাই শর্করা। তবে ভিটামিন এ প্রচুর পাবেন। গরমে শর্করার কমিয়ে ফল, সবজি, দুধ, দই খাদ্য তালিকায় স্থান দিন। প্রতিদিন ২.৫ লিটার জল গ্রহণ যথেষ্ট। ৩ লিটার পর্যন্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে কিডনির রোগী ও ফ্লুয়িড রিটেনশন সিনড্রোম রোগীরা জল গ্রহণের ব্যাপারে সতর্ক হোন। □

# অক্ষয় পুণ্যলাভের তিথি অক্ষয় তৃতীয়া

নন্দলাল ভট্টাচার্য

**চিরন্তন আহ্বান**

এ বঙ্গজীবন চৈতন্যময়। এ জীবনের চেতনার রঙে পান্না হয় সবুজ। চুনি আরক্ত হয় রক্তরাগে। গোলাপ হয় সুন্দর। এক আশ্চর্য অলৌকিক প্রজ্ঞার বিভায় উদ্ভাসিত হয় এই বঙ্গজীবন। এ জীবনের অঙ্গে অঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে এক ধর্মীয় সুবাস। রয়েছে পরমার্থ অন্বেষণের এক অন্তর্লীন প্রয়াস। চেতন বা অবচেতনে বঙ্গজীবন অনুসরণ করে চলেছে পরা ও অপরা বিদ্যার নানা প্রসঙ্গকে। আর সে কারণেই বঙ্গ তথা ভারতীয় জীবনের সব পূজাঅর্চনা, সব সাধনা, পালপার্বণ-ব্রত ইত্যাদি যাবতীয় অনুষ্ঠানের প্রাণভোমরা হয়ে রয়েছে এক ঋদ্ধ জীবনবোধের প্রকাশ। নববর্ষের প্রায় সূচনা পর্বের এমনই প্রাণময় অনুষ্ঠান অক্ষয় তৃতীয়াও বহন করে চলেছে সেই শাশ্বত জীবনবোধকে। সে কারণেই দিনটি সকলের কাছেই অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। মূলত এটি বঙ্গরমণীর পালনীয় একটি অনুষ্ঠান হলেও এর পেছনে রয়েছে এক মহতের চিরন্তন আহ্বান। আছে এর একটি ভিন্নতর গুরুত্বও।

বৈশাখের শুক্লাতৃতীয়া তিথিটিই ভারতীয় ধর্মসাধনার ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে অক্ষয় তৃতীয়া হিসেবে। নানা কারণেই দিনটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক অক্ষয়, অক্ষর, অব্যয় সত্তার কথা। রয়েছে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর জীবনে উত্তরণ তথা নিঃশোষিত হবার দুর্মর বাসনার কথা। সেই অর্থে, অক্ষয়তৃতীয়া এক অবিনশ্বর আত্মায় আশ্লিষ্ট হওয়ার কামনারও অনুষ্ঠান।

**উৎসে উপনিষদ**

অনেকে মনে করেন, অক্ষয় তৃতীয়ার আনুষঙ্গিক ভাবনার বীজ উপনিষদ বা বৈদিক সাহিত্যে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় বৃহদারণ্যক উপনিষদের কথা। ওই উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের কাহিনি হলো, প্রজাপতির তিন সন্তান— দেবতা, মানুষ ও দানব বা অসুররা ব্রহ্মচর্য পালন করে পিতা প্রজাপতিকে প্রণাম করে বলে, আপনি আমাদের উপদেশ দিন।

দেবতা, মানুষ ও দানবরা এসেছিল ভিন্ন ভিন্ন সময়। তিনজনের জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রজাপতি উচ্চারণ করে একটি মাত্র বর্ণ— 'দ'। তারপর জানতে চান, তারা এই উপদেশের মর্মার্থ বুঝতে পেরেছে কিনা। তিনজনই বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে জানায়, হ্যাঁ, তারা বুঝতে পেরেছে 'দ'-এর অর্থ।

প্রজাপতি বলেন, বেশ বলো তো কী বুঝেছ? উত্তরে দেবতারা বলে, 'দ'। এর অর্থ দমন করো। সংযত হও। শুনে প্রীত প্রজাপতি বলেন, 'কল্যাণ হোক।' একই ভাবে মানুষ জানায় 'দ'। এর অর্থ দান করো আর দানবদের মনে হয় ওই 'দ' বর্ণটির অর্থ হবে দয়া করো।

প্রজাপতি সকলেই বলেন, যথার্থ বুঝেছ তোমরা। আসলে যার যে বিষয়ে ঘাটতি রয়েছে সে সেই বিষয়টিকেই 'দ'-এর অর্থ মনে করেছে। প্রকৃত অর্থে প্রতিটি মানুষেরই এই তিনের সাধনা করা দরকার। প্রজাপতিও বলেছেন সেই কথাই— তদেতত্ত্রয়ং শিক্ষেদ্ দমং দানং দয়ামিতি— দম, দান, দয়া— এই তিনটিই শিক্ষা করবে।

অক্ষয় তৃতীয়া ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে এই তিনটি বিষয়েই

শিক্ষা অর্জনেরই চেষ্টা করে মানুষ। সংযম তথা ইন্দ্রিয়কে বশে রেখে দান এবং অন্যকে দয়া করাই বস্তুত এই অনুষ্ঠানের মূল কথা।

**নামের তাৎপর্য**

অক্ষয় তৃতীয়া একটি সর্বভারতীয় উৎসব বা অনুষ্ঠান। কেবল হিন্দু নয়, জৈনদের কাছেও এটি একটি অতি পবিত্র ও শুভদিন। এই শুভদিনে যা কিছু করা হয়, অনন্তকাল ধরে তার ফল পাওয়া যায়, এমনটাই হলো লোক বিশ্বাস।

অক্ষয় ও তৃতীয়া— এই দুটি শব্দ যোগে নিষ্পন্ন হয়েছে অক্ষয় তৃতীয়া শব্দটি। এই নামকরণ থেকেই বোঝা যায় এর বিশেষ তাৎপর্যের কথা। অক্ষয় শব্দটির অর্থ অবিনশ্বর— চিরন্তন। শব্দটি সমৃদ্ধি, প্রত্যাশা, আনন্দ ও সাফল্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। ত্রিত বা তৃতীয়া শব্দটি একটি তিথির নাম। হিন্দু পঞ্জিকায় মাসে দু'টি করে তৃতীয়া আসে। এক্ষেত্রে বলা হয়েছে শুক্লপক্ষের তৃতীয়ার কথা। পঞ্জিকা অনুসারে বসন্তকাল অর্থাৎ মধু বা চৈত্র এবং মাধব বা বৈশাখ ধরে ব্যাপ্ত। এই মাধব মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিটিই বিশেষভাবে অক্ষয় তিথি হিসেবে খ্যাত। বৈদিক বিশ্বাসে বৈশাখের এই বিশেষ তিথিটি সব অর্থেই মানুষকে করে অনন্ত পুণ্যের অধিকারী। আর সেই কারণেই বিশেষ তিথিটি ভারতীয়দের কাছে অত্যন্ত অর্থবহ। পার্থিব ক্ষেত্রে এটি সাফল্য ও সৌভাগ্যের প্রতীক। ধন-সম্পদ ও সমৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত এই দিনটিতে দান, ধ্যান এবং কোনো কিছু লগ্নি করলে তার শুভ ফল পাওয়া যায় অনন্তকাল ধরে। সেই কারণেই সারা ভারতেই এই দিনটি পালন করা হয় অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে। বঙ্গের এই অক্ষয় তৃতীয়াই গুজরাট ও রাজস্থানে ভিন্ন নাম আকতি বা আখাতীজ। পরশুরাম জয়ন্তী হিসেবেও দিনটি পালিত হয় কোথাও কোথায়ও।

**গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান**

বঙ্গদেশ তথা সারা ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু সমাজের কাছে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ। দিনটি সর্বত্রই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সমারোহের সঙ্গে পালিত হয়। এই দিনটি অর্থাৎ অক্ষয় তৃতীয়া দিবসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানা আচার অনুষ্ঠান এবং সুমহান ঐতিহ্য।

ভক্ত ও ধর্মবিশ্বাসীরা বিভিন্নভাবে দিনটি পালন করেন। মূল অনুষ্ঠান হলো অক্ষয় তৃতীয়ার বিশেষ পূজা। পারিবারিক ঐতিহ্য ও আচার অনুযায়ী কুলদেবতা অথবা লক্ষ্মী-গণেশের পূজা করা হয় এই দিনে। একইসঙ্গে করা হয় নারায়ণ বা বিষ্ণুপূজা। বহু বৈষ্ণব এদিন উপবাস করেন। একই সঙ্গে সামাজিক ভোজ ও দরিদ্রনারায়ণ সেবার আয়োজন করেন। এদিন গরিব মানুষদের মধ্যে বস্ত্র এবং অন্যান্য দ্রব্যও বিতরণ করেন তাঁরা।

অক্ষয় তৃতীয়ার দিনটি অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। ওই কারণে এই দিনটিতে নতুন কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়। নতুন ব্যবসা শুরু অথবা গৃহপ্রবেশের জন্যও দিনটি অত্যন্ত শুভ বলে মনে করেন সকলে।

অন্যদিকে বিশেষ করে বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহে চন্দন লেপন করে বিশেষ পূজা করেন এইদিন। বিশ্বাস, এদিন এভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করলে মোক্ষলাভ করা যায়। চিরতরে স্থান পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণের চরণে। এদিন বহুজন হাতে, গলায় ও বাহুতে রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন। রুদ্রাক্ষ ধারণ করলে অপশক্তির প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এমনই বিশ্বাস। সাধারণত সাতমুখী, দশমুখী, তেরোমুখী, ষোলো ও উনিশমুখী রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন ভক্তরা। তবে ভগবান বিষ্ণু দশ ও উনিশমুখী রুদ্রাক্ষেই বেশি তুষ্ট হন। কৃপা করেন সকলকে। দেন শুভ ফল। এমনই শাস্ত্রীয় বচন।

**রাজ্যে রাজ্যে**

অক্ষয় তৃতীয়া একটি সর্বভারতীয় উৎসব অনুষ্ঠান। অঞ্চলভেদে এক-এক অঞ্চলে এক-একভাবে পালিত হয় এই দিনটি। যেমন উত্তরপ্রদেশের বৃন্দাবনে বাঁকেবিহারী মন্দিরে এই দিনটি এক বিশেষ তাৎপর্যর সঙ্গে পালিত হয়। রীতি অনুযায়ী বাঁকেবিহারীর দু'টি পা সারা বছর কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকে। চাইলেও ভক্তরা ওই চরণ দর্শন করতে পারেন না। কিন্তু অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে বাঁকেবিহারীর পায়ের ওই আবরণ সরিয়ে নেওয়া হয়। ভক্তরা ধন্য হন বাঁকেবিহারীর চরণ দর্শন করে। আর ওই কারণেই ভক্তরা বছরভর অপেক্ষা করে থাকেন এই দিনটির জন্য। দিনটিতে বৃন্দাবন কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয় ভক্ত সমাগমে।

ওড়িশায় এই দিনটিতেই শুরু হয় রথ তৈরির কাজ। কৃষকরাও

এই দিনটিতেই ধানের বীজ বোনার কাজ শুরু করেন।

মহারাষ্ট্রে বিবাহিতা মহিলারা এই দিনটিতে স্বামীর মঙ্গল এবং দীর্ঘজীবন কামনায় দেবী দুর্গা বা গৌরীর পূজা করেন। মহিলারা একে অন্যের কপালে হলুদ ও কুমকুমের তিলক পরিয়ে দেন।

তামিলনাড়ুতে এদিন বিষ্ণুমন্দিরগুলিতে হয় বিশেষ পূজা ও প্রার্থনা। ভক্তরা সেদিন ব্রাহ্মণদের ভোজ্য এবং নানা জিনিস দান করেন।

ছত্তিশগড়ে দিনটি পালিত হয় 'মাটি পূজন দিবস' হিসেবে। দিনটিতে জৈব চাষ সম্পর্কে বিশেষ প্রচার করা হয়।

বঙ্গদেশে অক্ষয় তৃতীয়া দিনটি পালন করা হয় বিশেষ মর্যাদা ও তাৎপর্যের সঙ্গে। এই দিনটিতে সধবা মহিলারা স্বামীর মঙ্গল ও দীর্ঘজীবন কামনায় পূজা, ব্রত ও উপবাস পালন করেন। সাধ্যমতো তাঁরা দানধ্যানও করেন। সধবা মহিলাদের মতো রাজ্যের ব্যবসায়ী, বিশেষ করে স্বর্ণবণিক সম্প্রদায় এদিন লক্ষ্মীর পূজা করেন। পয়লা বৈশাখের পরিবর্তে তাঁদের বেশিরভাগ এই দিনটিতে নতুন হালখাতা চালু করেন।

ঋষভদেব ও রাজা শ্রেয়াংশ

**নানা পুরাণ কথা**

ভারতীয় ধর্মজীবনের ইতিহাসে বিভিন্ন কারণেই বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়া এক অনন্য তিথি। বহুমাত্রিক এই দিনটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বহু মহিমময় ঘটনা। বিভিন্ন পুরাণ ও মহাকাব্য থেকে জানা যায়, এই তিথিটিতেই ঘটেছে এমনসব ঘটনা যার যে কোনো একটি জন্যই এটি চিহ্নিত হতে পারত এক পুণ্যদিন হিসেবে। এবার বরং বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়াতে ঘটে যাওয়া সেইসব ঘটনার দিকে নজর ফেরানো যাক।

পুরাণমতে, এই বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ার দিনেই সত্যযুগ অবসানের শেষে শুরু হয় ত্রেতাযুগ। অবশ্য কোথাও কোথাও বলা হয়েছে, এই দিনই সূচনা হয়েছিল সত্যযুগের।

এই দিনটিতে মর্ত্যে অবতরণ ঘটেছিল সর্বপাপহারিণী গঙ্গার। পৃথিবীকে কলুষমুক্ত করে মানুষের মুক্তির পথ প্রশস্ত করার জন্যই স্বর্গলোক থেকে ভূলোকে প্রবাহিত হয় গঙ্গা। আর এই কারণেই এই দিন গঙ্গাস্নান করে শুদ্ধি ও আশীর্বাদের জন্য প্রার্থনা করে মানুষ।

স্কন্দ পুরাণের এক কাহিনি, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ দেবরাজ ইন্দ্র একবার জোর করে এক ঋষি পত্নীর লজ্জাহরণ করেন। তারপরই ঋষির অভিশাপের ভয়ে ইন্দ্র স্বর্গ ছেড়ে মেরুপর্বতে পালিয়ে যান। এই কুকর্মের জন্য ইন্দ্র হারান তাঁর সব শক্তি ও মর্যাদা। তাঁর এই অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে দৈত্যরা স্বর্গ দখল করে। হতমান দেবতারা তাঁদের গুরু বৃহস্পতির শরণ নেন। বৃহস্পতির পরামর্শে ইন্দ্র এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে বিশেষ উপাসনার পর দান ধ্যান করে ঐশ্বরিক ক্ষমতা ফিরে পান। দৈত্যদের পরাজিত করে আবার তিনিই হন অমরার অধিপতি।

এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনেই বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম আবির্ভূত হন। দুর্নীতিগ্রস্ত ক্ষত্রিয়দের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষার জন্য তিনি একাধিকবার ক্ষত্রিয়নিধন করেন।

বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনি থেকে জানা যায়, অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যদিনেই ক্ষুধার্তদের অন্নদানের জন্য আবির্ভাব ঘটে দেবী অন্নপূর্ণার। বলা হয়, ক্ষুধার্তদের প্রতিভূ হিসেবে শিব অন্ন প্রার্থনা করলে তাঁর ক্ষুধা নিবারণের জন্য অন্নপূর্ণা রূপে আবির্ভূত হয়ে শিব তথা বিশ্বকে অন্ন জোগান দেবী পার্বতী। আবার এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনই কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাসদেব মহাভারত রচনা শুরু করেন। তাঁর এই মহাকাব্য রচনার কাজে সাহায্য করার জন্য গণেশ লেখনী ধারণ করেন। অন্য আর এক কাহিনি, এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনই ব্রাহ্মণ সুদামার কাছ থেকে একমুঠো চিঁড়ে চেয়ে নিয়ে খান তাঁরই বাল্যবন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী শ্রীকৃষ্ণ। আর ওই এক মুঠো চিঁড়ের বিনিময়ে সুদামাকে দেন তিনি অতুল ঐশ্বর্য।

এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনই দেবাদিদেব শিব যক্ষপতি কুবেরকে ধনাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করেন তাই। ধনেশ কুবেরকে এই দিন বিশেষভাবে পূজা করা হয় ধনসম্পদ প্রাপ্তির জন্য।

মহাভারতের কাহিনি, এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনই কৌরব সভায় বস্ত্রহরণের সময় অলক্ষ্যে থেকে দ্রৌপদীকে বস্ত্র জুগিয়ে যান শ্রীকৃষ্ণ। আবার এই দিনই পাণ্ডবঘরনি দ্রৌপদীকে অক্ষয়

অন্নস্থালী দান করেন সূর্যদেব। এই দিনই সেই অন্নপাত্র থেকে একখানা অন্নদানা আর শাকের টুকরো খেয়ে তৃপ্ত শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুধা হরণ করেন ঋষি দুর্বাসা ও তাঁর হাজার শিষ্যের। এইভাবে তিনি রক্ষা করেন পাণ্ডবদের দুর্বাসার সম্ভাব্য ক্রোধ বহ্নি থেকে। একই সঙ্গে ব্যর্থ হয় দুর্যোধনের চক্রান্তও।

হিন্দু পুরাণগুলির মতোই জৈন পুরাণেও আছে, প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব এই অক্ষয় তৃতীয়াতেই এক রাজার দেওয়া আখের রস পান করে বছরের উপবাস ভঙ্গ করেন। আর সেটা স্মরণ করেই জৈনরা এদিন অন্নদান করেন।

**অন্যতম পবিত্র দিন**

মৎস্যপুরাণের বক্তব্য, অক্ষয় তৃতীয়া হলো বছরের অন্যতম পবিত্র দিন। এই দিনটি যারা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন, তাঁরা হন বহু সৌভাগ্যের অধিকারী। এই দিন দীনদরিদ্রদের খাদ্য বস্ত্র দান বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করলে যে পুণ্য অর্জন করা হয়, তা নিয়ে আসে চির সৌভাগ্যের বার্তা।

মৎস্যপুরাণে অক্ষয় তৃতীয়া পালনের বিধি ব্যবস্থায় বলা হয়েছে, অক্ষয় তৃতীয়া ব্রত পালনকারীরা প্রভূত সম্পদ ও পুণ্যের অধিকারী হন। এই ব্রত পালনের সময় বিষ্ণুকে অক্ষত অর্থাৎ আতপচালের নৈবেদ্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে ব্রতের অঙ্গ হিসেবেই ব্রাহ্মণদের ভোজ্যদান এবং পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে জল, মিষ্টি ও ফল নিবেদন করতে বলা হয়েছে। অনেকে ওই সময় বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও কুবেরের আরাধনা করেন। পূজার অঙ্গ হিসেবেই তুলসী নিবেদনের কথা বলা হয়েছে। ব্যবসাবাণিজ্যে বিনিয়োগের পক্ষে এই দিনটিকে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে বিজ্ঞাপন ও প্রচারের কারণে ধনতেরাস অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু ঐতিহ্যগত ভাবে অক্ষয় তৃতীয়াতেই রয়েছে সোনা কেনার কথা। আজও স্বর্ণব্যবসায়ীরা সেই ধারাই বহন করে চলেছেন অক্ষয় তৃতীয়ার দিন হালখাতার আয়োজন করে। আজও প্রাচীনরা এইদিনেই সোনা কেনার রীতিটি মেনে চলেন ধর্মীয় আচার হিসেবেই।

শাস্ত্রমতে অক্ষয় তৃতীয়াটির দিনটি অত্যন্ত শুভ ও পুণ্যফলদায়ী। সে কারণে এই দিনটিতে সকলকে শুদ্ধচিত্তে সংযম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন শাস্ত্রকাররা। সেইসঙ্গে শাস্ত্রকারদের হুঁশিয়ারি, দিনটি পুণ্যফল দেয় বলেই এদিনে কোনো অসৎ কাজ করলে সীমাহীন পাপের বোঝা বইতে হয়। তাই এই দিনটি পালন করতে না পারলেও সবরকম অহিতকর এবং পাপকর্ম ও চিন্তা থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে আমাদের শাস্ত্রে।

**অক্ষয় তৃতীয়ার শিক্ষা**

বারো মাসে তেরো পার্বণের শঙ্খনিনাদে মুখরিত বঙ্গজীবনে অক্ষয় তৃতীয়া নানা কারণেই অত্যন্ত বাঙ্ময় লৌকিক-পৌরাণিক আধারে অনুষ্ঠিত। এই অনুষ্ঠানে একইসঙ্গে ঠাঁই করে নিয়েছে বৈদিক পূজাপদ্ধতি আবার লৌকিক ব্রতকথা। এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনেই বঙ্গরমণীরা কেউ করেন অক্ষয় সিঁদুর ব্রত, কেউ অক্ষয় ফল ব্রত, আবার কেউ করেন অক্ষয় বট বা অক্ষয় কুমারী ব্রত। প্রতিটি ব্রতই করা হয় চার বছর ধরে। প্রতিটি ব্রতেরই আকুতি— সর্বে ভবন্তু সুখীন সন্তু— সন্তু সর্বে নিরাময়— সুখী হোক— সুন্দর হোক পরিবারের বিশেষ করে স্বামীর জীবন। প্রতিটি ব্রতেরই আকাঙ্ক্ষা— স্বামীর দীর্ঘজীবন আর শাঁখা সিঁদুর নিয়ে কাঙ্ক্ষিতধামে প্রস্থান— অর্জিত অক্ষয় পুণ্যের মূল্যে।

অক্ষয় তৃতীয়ার ব্রতকথার উৎস মহাভারত। অক্ষয় তৃতীয়ার মাহাত্ম্যের কথা যুধিষ্ঠিরকে শুনিয়েছিলেন ঋষি শতানীক। তিনি বলেন, পুরাণকালে ছিল এক দুর্বাসা-সম ব্রাহ্মণ। সবসময়ই তিরিক্ষি মেজাজ। মিষ্টি কথা বা ব্যবহার তাঁর কাছে এক অলীক বস্তু।

বৈশাখের এক তপ্ত দিনে অনেক ব্রাহ্মণের কাছে খাদ্য ও পানীয় চান একজন। যথারীতি ব্রাহ্মণ তাকে কিছু না দিয়েই তাড়িয়ে দিতে যান। বাধা দেন ব্রাহ্মণী। সেই অনাহূতকে ডেকে তিনি দেন খাদ্য ও পানীয়। এর বেশ কিছুদিন পরে মৃত্যু হয় ব্রাহ্মণের। তারপরেই ঘটে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। যমদূতরা ব্রাহ্মণকে যমরাজের কাছে নিয়ে যেতেই তিনি বলেন, এ কাকে এনেছো! মহাপুণ্যবান এ ব্যক্তির স্থান যে বিষ্ণুলোকে।

অক্ষয় তৃতীয়ায় খাদ্য-পানীয় দানের এই মাহাত্ম্যর কথা শুনিয়ে ঋষি শতানীক বলেন, অক্ষয় পুণ্যদায়ী এই ব্রত পালন করতে হয় কম করে চারবছর। তাই ব্রত পূরণের জন্য যমরাজের নির্দেশে ব্রাহ্মণকে ফিরে আসতে হয় মরলোকে। সস্ত্রীক চার বছর ব্রত পালনের পর তাঁরা হন চিরদিনের জন্য বিষ্ণুলোকবাসী।

অশেষ পুণ্যের প্রতিরূপ এই অক্ষয় তৃতীয়ার শিক্ষা— বাক্য ও মননে মধুরভাষী হও— ভাগ করে করো অন্নপান— সকলের সঙ্গে। মন্ত্র হোক— অতিথি দেব ভব— অতিথি অথবা মানুষই দেবতা— সেবা করো তার। ◻

# সিউড়ী সরস্বতী শিশুমন্দিরের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

১৯৮৭ সালে শাশ্বত, সনাতন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে চিরভাস্বর ও চিরজাগরুক করে রাখার যজ্ঞে, নিরঞ্জন হালদার ও শ্যামল চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে সিউড়ীতে স্থাপিত হয় বীরভূম জেলার প্রথম সরস্বতী শিশুমন্দির, যা বর্তমানে সিউড়ী এসপি মোড় সংলগ্ন অরবিন্দপল্লীতে অবস্থিত। প্রতি বছরের মতো এবারও গত ২৭, ২৮ ও ২৯ মার্চ অরবিন্দপল্লী সরস্বতী শিশুমন্দিরে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো তিনদিনব্যাপী বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গত ২৯ মার্চ শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন এদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথা সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক সুশান্ত কুমার বর্ধন। বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি ও শিক্ষক অনিন্দ্য বিশ্বাস, বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ডাঃ সৌম্যদীপ গড়াই, শিশুমন্দিরের সভাপতি লক্ষ্মণ বিষ্ণু ও সম্পাদক পরিতোষ হাজরা। বরণ করা হয় তিলপাড়া ও পাইকপাড়া শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্য উজ্জ্বল নায়ক ও জিতেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় -সহ শিক্ষিকা কৃষ্ণা চক্রবর্তী ও সুপর্ণা ভট্টাচার্যকে। বিভিন্ন বিভাগের ও বিভিন্ন বিষয়ের পুরস্কার বিতরণের পরে হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নজর কাড়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশিত কবিগান ও বাউলগান, মানব পুতুল, প্রাদেশিক নৃত্য, 'অপারেশন সিঁদুর' ও 'বীরসা মুণ্ডা' নাটক। তবে তিনদিনব্যাপী সামগ্রিক অনুষ্ঠানই ছিল আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সিউড়ী অরবিন্দপল্লী সরস্বতী শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্য নির্মল ঠাকুর, আচার্যা সোমা গঙ্গোপাধ্যায়-সহ দু'জন ছাত্র-ছাত্রী। ১৫০ জনের কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' গান তথা রাষ্ট্র বন্দনার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

# নাসিক কুম্ভমেলার প্রস্তুতি বৈঠক

গত ৪ ও ৫ এপ্রিল মহারাষ্ট্রের নাসিকে 'অখিল ভারতীয় সন্ত সমিতি' কর্তৃক আসন্ন নাসিক কুম্ভমেলার একটি প্রস্তুতি বৈঠক সম্পন্ন হয়। দণ্ডীস্বামী ড. জীতেন্দ্রানন্দ সরস্বতী মহারাজের আহ্বানে ভারতের সমস্ত রাজ্য এবং বিভিন্ন দেশ থেকে অখিল ভারতীয় সন্ত সমিতি-র সকল পদাধিকারী এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন সন্ত সমিতি-র অখিল ভারতীয় অধ্যক্ষ জগদ্গুরু কুবেরাচার্য স্বামী অবিচল দেবাচার্য মহারাজ এবং আখাড়া পরিষদের পরমাধ্যক্ষ স্বামী রবীন্দ্র পুরী মহারাজ। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ও কুম্ভমেলা বিষয়ক মন্ত্রী গিরিশ মহাজন নাসিকের পুণ্যভূমিতে সাধুসন্তদের সম্মান ও অভ্যর্থনায় উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রদেশ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজ এবং প্রদেশ মহাসচিব শ্রীমৎ ব্রহ্মবিদ্যানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন, যাঁদের মধ্যে স্বামী কালিকানন্দ মহারাজ, স্বামী ব্রহ্মস্বরূপানন্দ মহারাজ, শ্রীবন্ধুগোপী দাস, শ্রী ভোলানাথ গোস্বামী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

ফঃ ৪

# পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রে হিন্দুত্ব বিষয়ক আলোচনাসভা

'ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অফ হিন্দু অ্যাকাডেমিশিয়ান্স' বা ডব্লুএএইচএ-র উদ্যোগে গত ১ এপ্রিল পূর্ব কলকাতায় বিধাননগরে পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের ঐকতান সভাগৃহে আয়োজিত হয় একটি মহতী আলোচনাসভা। 'Universal Vedic Consciousness'- বিষয়ক এই আলোচনাসভায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে উপস্থিত হয়েছিলেন বহু কর্মরত ও প্রাক্তন প্রশাসক, অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদ-সহ ৮০ জন পিএইচডি ডিগ্রি-প্রাপ্ত বিশিষ্টজন। আলোচনাসভাটি আয়োজনের ক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থা রূপে যুক্ত হয়েছিল মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজ এবং পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ডব্লুএএইচএ-র দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠান কলকাতা শহরে এবার প্রথম। বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় প্রথম সত্রের প্রারম্ভিক বক্তৃতা দেন। ডব্লুএএইচএ-র প্রয়োজনীয়তা, 'হিন্দুত্ব'কে স্থির লক্ষ্য রাখবার জন্য কীভাবে সংগঠনটি কাজ করে চলেছে— এই বিষয়গুলি এদিন তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে। হিন্দুত্বের বিবিধ প্রকাশ সম্পর্কে তিনি উপস্থিত বিদ্বজ্জনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বঙ্গভূমির সঙ্গে হিন্দুত্বের সুগভীর সম্পর্কের দিকগুলি তাঁর বক্তব্যে পরিবেশিত হয় যুক্তিপূর্ণভাবে। পশ্চিমবঙ্গে কেন হিন্দুত্বের বিষয়ে কাজ করা দরকার তা তাঁর জ্ঞানগর্ভ ও বিশ্লেষণী বক্তৃতায় এদিন প্রতিভাত হয়।

এদিনের সভায় প্রধান বক্তা রূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অখিল ভারতীয় সংগঠন মন্ত্রী মিলিন্দ পরান্দে। আলোচনার প্রথম পর্বে তিনি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন 'হিন্দুত্ব'। তিনি বলেন যে, হিন্দুত্ব হলো— মহাভারতের কর্ণের সহজাত কবচকুণ্ডল-প্রতিম। যার বিহনে মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত হয় কর্ণের। তেমনই হিন্দুজাতি তথা ভারতীয় সভ্যতা সহজবধ্য হয়ে ওঠে হিন্দুত্বের দৃঢ় সুরক্ষা-আবরণী না থাকলে। এই বর্ম সর্বাবস্থায় ভারতবর্ষকে রক্ষা করে এবং ঢাল হয়ে দাঁড়ায় সর্ববিধ আক্রমণের সম্মুখে। শাস্ত্র, শস্ত্র ও জীবনযাপনের ত্রিবিধতায় স্থির লক্ষ্য এই সজীব ধারা। সভার শেষ সত্রে অন্যান্য বক্তাদের বক্তব্যের পর তিনি সমস্ত আলোচনার একটি সমাপনী ও নির্ণায়ক বৃত্ত উপস্থাপনও করেন। হিন্দু সমাজের জন্য তাত্ত্বিক লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসার আহ্বান তিনি জানান সভায় উপস্থিত প্রবুদ্ধমণ্ডলীর উদ্দেশে। দিল্লি-সহ ভারতের আরও বেশ কয়েকটি শহরে গত বছর ও এই বছরে একাধিক ডব্লুএএইচএ চ্যাপ্টারের আলোচনাসভা আয়োজিত হয়েছে। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে ডব্লুএএইচএ-র পূর্ববর্তী আলোচনাসভাগুলির প্রসঙ্গ। তিনি বলেন যে, সারা দেশে বড়ো শহরগুলিতে এই ধরনের আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, আগামীদিনে আরও হবে। সর্বত্র ভালো সংখ্যক প্রবুদ্ধজনের উপস্থিতি লক্ষণীয়। দেশে যে হিন্দুবিরোধী বিমর্শের প্রাধান্য রয়েছে তাকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে, ভারতীয় বিমর্শের প্রচার-প্রসারের দ্বারা সঠিক মত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজের বিদ্বান ব্যক্তি ও বিশিষ্টজনদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে এই ধরনের উদ্যোগের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার বিষয়টিও তিনি তুলে ধরেন। বক্তাদের বক্তব্যের মাঝে চলে প্রশ্নোত্তর পর্ব। এই পর্বে তিনি শ্রোতাদের বেশ কিছু প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর দেন।

এই আলোচনাসভায় অন্যতম বক্তা রূপে উপস্থিত ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের নির্দেশক ড. সরূপপ্রসাদ ঘোষ। তাঁর সুললিত ও তথ্যনির্ভর বক্তৃতায় উঠে আসে, কীভাবে লেফট্- লিবারেলরা নিজেদের প্রোপাগান্ডা ছড়াতে বাঙ্গালির মধ্যে কৃত্রিম বিভাজন সৃষ্টি করছে। মোহনবাগান-ইস্ট বেঙ্গল, ঘটি-বাঙ্গাল, চিংড়ি-ইলিশ ইত্যাদি বাইনারি এরই ফসল। 'বন্দে মাতরম্'-এর মধ্যে উদ্ভাসিত সেই অপার মহিমময় মাতৃমূর্তির বিবিধ প্রসঙ্গ ড. ঘোষের বক্তব্যে এদিন উঠে আসে। কীভাবে ভারতের ইতিহাসকে বিকৃত করার প্রচেষ্টা ধারাবাহিকভাবে করা হয়েছে, তাও তিনি ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম বিভিন্ন যুগের যথার্থ ইতিবৃত্ত পাঠ ও সঠিক ইতিহাস চর্চা থেকে বঞ্চিত থেকেছে। সুকৌশলে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে সেইসব ইতিহাসবিদদের এবং তাঁদের রচিত গ্রন্থগুলিকে, যাঁদের মধ্যে বর্তমান ছিল ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা এবং যাঁরা দেশ বিভাজনের রাস্তায় যাননি।

প্রথম সত্রে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি হিন্দুত্বের বেশ কিছু প্রায়োগিক দিক এদিন তুলে ধরেন। হিন্দুত্বের দ্বারা প্রদত্ত ধারণা পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কীভাবে কার্যকরী, কিংবা পরিবার প্রবোধন কীভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হিন্দুত্বের সহযাত্রী— তা শ্রোতাদের সামনে তিনি উপস্থাপন করেন। পশ্চিমবঙ্গে 'হিন্দুত্ব' যে বহিরাগত কোনো ধারণা নয়, বরং তা একান্তই বঙ্গের নিজস্ব জীবনদর্শন, সেই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন ড. বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ছিল উদাসীন— এই ধরনের বাম-কংগ্রেসি ন্যারেটিভ খণ্ডন করে তিনি জানান যে, সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় ডাক্তারজীর সঙ্গে বঙ্গপ্রদেশের বিপ্লবী সংগঠনগুলির গভীর যোগাযোগের কথা। তাঁর আলোচনায় উঠে আসে পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে রাষ্ট্রবাদী সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও অনিবার্যতার প্রসঙ্গ। প্রথম সত্রে তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন নিউ আলিপুর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অনিকেত মহাপাত্র। এ রাজ্যে হিন্দুত্বের অনুশীলন তথা হিন্দু সমাজের সামনে থাকা চ্যালেঞ্জগুলিকে কীভাবে মোকাবিলা করা যায় সেই বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, ভারত ও হিন্দুত্ব অঙ্গাঙ্গী, যা সমগ্র বিশ্বের জন্যও দিক নির্দেশিকা। পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষিতে হিন্দুত্বের ন্যারেটিভকে ব্যবহার করে কীভাবে বাম- ইসলামিকদের মারক সমীকরণের প্রতিপাদ্যকে নস্যাৎ করা যায় তা তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে। অতিথিদের বক্তব্য শেষ হলে সভায় বিশিষ্টজনদের উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)-এর সভাপতি ও কলকাতা হাইকোর্টের বরিষ্ঠ আইনজীবী সুবীর সান্যাল। সমবেত কণ্ঠে পূর্ণ 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের মাধ্যমে সভার পরিসমাপ্তি ঘটে। মসী ও অসির যৌথ প্রয়োগে ভারতীয় সভ্যতার পুনরুত্থান হবে নতুন গৌরবে। এই প্রত্যয় নিয়ে এদিনের আলোচনাসভা সমাপ্ত হয়। সভা চলাকালীন সভাগৃহ জুড়ে ছিল বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা। উল্লেখ্য, সভায় উপস্থিত ৮০ জনের একটা বড়ো অংশ ছিল যুবসমাজের প্রতিনিধি। মিলিন্দজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের কয়েকজন গবেষক এই কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন বলে এদিন তাঁদের নাম লিপিবদ্ধ করেন।

# ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সভাগৃহে 'বন্দে মাতরম্'-এর সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন

গত ৮ এপ্রিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সভাগৃহের উদ্যোগে এই সভাগৃহের 'গ্রেট ইন্ডিয়ান রিফমার্স গ্যালারি'তে আয়োজিত হয় 'বন্দে মাতরম্'-এর সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান। 'বন্দে মাতরম্'-প্রণেতা সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৩২তম প্রয়াণবার্ষিকীতে

আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সভাগৃহের অছি পরিষদের চেয়ারম্যান— শ্রী আরএন রবি। এদিনের অনুষ্ঠানে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়। এর সঙ্গে আয়োজিত হয়— ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সভাগৃহের নিজস্ব সংগ্রহ-আধারিত নানা দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য ঐতিহাসিক সামগ্রী, স্মৃতিচিহ্ন ও নিদর্শন সংবলিত একটি বিশেষ প্রদর্শনী এবং 'সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ'-এর পরিবেশনায় 'বঙ্কিম ও স্বদেশ চেতনা'-শীর্ষক একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মাননীয় রাজ্যপাল এদিন প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন। রাজ্যপাল-সহ এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় সংগ্রহালয়ের নির্দেশক ড. সায়ন ভট্টাচার্য্য, সংস্কার ভারতীর অন্যতম কেন্দ্রীয় সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায়, সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)-এর কার্যকরী সভাপতি সুভাষ ভট্টাচার্য্য, বিপ্লবী পরীক্ষিৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রবধূ মঞ্জু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্টজন।

# জাতীয় গ্রন্থাগারে ‘বন্দে মাতরম্’-এর সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন

গত ৩ এপ্রিল ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে এবং ফ্রিডম ফাইটার কাঙালদা ফাউন্ডেশন ও সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিআরডি)-এর যৌথ প্রয়াসে কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারের সভাকক্ষে রাষ্ট্রগীত ‘বন্দে মাতরম্’-এর সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি মনোজ্ঞ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারের প্রতিনিধি-সহ বিশিষ্ট অতিথিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এদিনের আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণকারী বক্তাদের বক্তব্যের মূল বিষয় ভাবনা ছিল— ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে পরাধীনতার গ্লানি মুক্তির জন্য স্বদেশব্রতে বঙ্গের দীক্ষা এবং বাঙ্গালির আত্মত্যাগ ও অবদানকে স্মরণে রেখে নতুন উদ্যমে আগামীদিনের পথনির্দেশনা। স্বদেশ চেতনা জাগরণের মধ্যে দিয়ে সুস্থ, সুন্দর সমাজ গঠনের লক্ষ্যে অঙ্গীকার গ্রহণ ছিল এদিনের আলোচ্য বিষয়। সভায় উপস্থিত বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন— প্রাক্তন আইপিএস আধিকারিক ও বিশিষ্ট লেখক ড. তপন চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লবী পরীক্ষিৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র ও পৌত্রবধূ অমল মুখোপাধ্যায় ও মঞ্জু মুখোপাধ্যায়, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আইএনএ সিক্রেট সার্ভিসের সদস্য সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লবী গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র শান্তনু মুখোপাধ্যায়, চট্টগ্রাম পরিষদের সহ-সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার দত্ত, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক প্রশান্ত ভট্ট, সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায়, ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সংগঠন মন্ত্রী শ্রীনিবাসজী প্রমুখ বিশিষ্টজন।

# নন্দীগ্রামে সাহিত্য উৎসব

গত ৫ এপ্রিল পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে বেদ মন্দির প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় একটি সাহিত্য সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এবং জেলার বাইরের প্রায় শতাধিক কবি ও সাহিত্যিক। উপস্থিত ছিলেন খেজুরি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. অসীম কুমার মান্না, বিশিষ্ট কবি জয়দেব মাইতি, কবি কৃতিসুন্দর পাল, দীনেশ ভূঁইয়া, ড. মনোরঞ্জন গায়েন, প্রণব ভূঁইয়া, অশোক জানা, বীথিকা মহাপাত্র, মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অনেক বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক। কবিতা পাঠ, গান ইত্যাদির সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনাসভা। ‘সাহিত্যের আঙিনায়’ নামক একটি মননশীল সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনাসভায় আধুনিক কবিতা ও তার বাস্তব স্বরূপ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট লেখক ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি। ড. অসীম কুমার মান্না, ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি, জয়দেব মাইতি ও গুরুপদ জানা— এই চার জন কৃতী ব্যক্তিকে এদিনের অনুষ্ঠানে গুণীজন সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. আলোক কুমার গিরি আশাপ্রকাশ করেন যে, পরের বারও একই রকমভাবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে ‘সাহিত্যের আঙিনায়’ গোষ্ঠীর আয়োজিত অনুষ্ঠান।

# হিন্দুত্বের মূল্যবোধে অক্ষয় তৃতীয়া উদ্‌যাপন

**প্রদীপ মারিক**

সংস্কৃত ভাষায় অক্ষয় শব্দের অর্থ হলো অবিনশ্বর, ক্ষয় যার নেই। অক্ষয় মানে সমৃদ্ধি, প্রত্যাশা, আনন্দ, সাফল্য। বৈদিক বিশ্বাসানুসারে, এই পবিত্র তিথিতে কোনো শুভকার্য সম্পন্ন হলে তা অনন্তকাল অক্ষয় হয়ে থাকে। হিন্দু জীবনে অক্ষয় তৃতীয়ার গুরুত্ব অসীম। হিন্দু পঞ্চাঙ্গের সৌন্দর্য হলো, হিন্দু ক্যালেন্ডার গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান দ্বারা চালিত হয়, তাই হিন্দু পঞ্চাঙ্গে প্রতিটি মাসকে পক্ষ বা ১৫ দিনে ভাগ করা হয় যা শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ নামে পরিচিত। শুক্ল পক্ষ অমাবস্যা বা অমাবস্যার পর দিন থেকে শুরু হয় এবং কৃষ্ণপক্ষ অর্থাৎ পূর্ণিমার পর থেকে অমাবস্যা দিন পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। অক্ষয় তৃতীয়া বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয় চান্দ্র দিনে পড়ে যা সাধারণত ইংরেজি ক্যালেন্ডারের এপ্রিল-মে মাসে পড়ে। সংস্কৃতে বৈশাখ মানে মন্থন করার লাঠি। এটি সারমর্ম, পদার্থ, সবচেয়ে শুভ বা শুদ্ধতম মন্থন করার মাস। কেদার-বদ্রী-গঙ্গোত্রী-যমুনেত্রীর যে মন্দির ছয়মাস বন্ধ থাকে এইদিনেই তার দ্বার উদ্‌ঘাটন হয়। দ্বার খুললেই দেখা যায় সেই অক্ষয়দীপ যা ছয়মাস আগে জ্বালিয়ে আসা হয়েছিল প্রজ্বলিত রয়েছে। ভাগবত পুরাণ অনুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে আবির্ভূত হন। সুদামা ছিলেন তার প্রাণের বন্ধু। সুদামা একদিন ভুলবশত শ্রীকৃষ্ণের সব খাবার একা খেয়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ খাবার খেতে চাইলে তিনি বলেন সব ছোলা পড়ে গেছে। সুদামা মিথ্যা কথা বলেন। পরে সুদামা মস্ত বড়ো পণ্ডিত হয়ে একটি টোল খোলেন। শ্রীকৃষ্ণ হন দ্বারকাধীশ। সুদামা সব সময় কৃষ্ণনাম করতেন। সুদামার সংসারে নেমে আসে দুর্যোগ। অভাব অনটনে দিন কাটতে থাকে।

খুব অনটনে দিন কাটালেও কখনো শ্রীকৃষ্ণকে দুঃখ মোচনের কোনো কথা বলেননি, অথচ তার ধ্যান জ্ঞান ছিল শ্রীকৃষ্ণ। সুদামার স্ত্রী সুশীলা একদিন সুদামাকে বলেন, তুমি এত কৃষ্ণ কৃষ্ণ করো তা একবার দেখে আসতে পারো না। সুদামা বলেন, কৃষ্ণ এখন দ্বারকার রাজা, আমাকে কি চিনতে পারবেন? নিশ্চয়ই চিনতে পারবে। তোমাকে কত ভালোবাসে। স্ত্রী, সন্তানদের কাতর অনুরোধে বাধ্য হয়ে যখন তিনি দ্বারকায় পৌঁছান। প্রিয় সখার জন্য নিয়ে যান চার মুঠো চিঁড়ে, যা সুশীলা ভিক্ষে করে এনে একটা কাপড়ে পুঁটলি করে দিয়েছিলেন। দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণকে সেই পুঁটলি বাঁধা চিঁড়ে দিলে পাছে কিছু মনে করতে পারে তাই সুদামা ধুতির কোঁচড়ে লুকিয়ে রেখেছিলেন সেই চিঁড়ে। বন্ধু সুদামার কাছ থেকে ভগবান জোর করে নিয়ে সেই চিঁড়ে খান এবং বলেন কলিযুগের সব বৈষ্ণবদের সব থেকে প্রিয় প্রসাদ হবে এই চিঁড়ে মাখা ভোগ। সুদামার বিশ্রামের সময় ভগবান দেখলেন তার পায়ের তলায় অজস্র কাঁটা ফুটে আছে, পরম প্রিয় সখা সুদামার পদযুগল স্বয়ং দ্বারকাধীশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চোখের জলে ধুইয়ে দিলেন। ভক্তের পায়ের কাঁটা

দাঁত দিয়ে তুলে দিলেন। এ যে ভক্ত আর ভগবানের পরম মিলন। তাঁকে খাওয়ানোর জন্য বন্ধু সুদামার আনা চিঁড়ে মুগ্ধ করেছিল শ্রীকৃষ্ণকে। এরপর শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে সুদামার সমস্ত দারিদ্র্য ঘুচে যায়।

মনে করা হয় যেদিন এই ঘটনা ঘটেছিল, সেদিন ছিল বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথি, অর্থাৎ অক্ষয় তৃতীয়া। সূর্যদেব দ্রৌপদীকে অক্ষয়পাত্র দিয়েছিলেন যখন পাণ্ডবরা বনবাস পর্ব শুরু করেছিলেন, যাতে তাদের সর্বদা প্রচুর পরিমাণে খাবার থাকে। এই অক্ষয় পাত্রের খাবার কখনো ফুরায় না। এই পাত্র থেকে দরিদ্র মানুষদের খাবার বিতরণ করতেন যুধিষ্ঠির।

দিনটি সত্যযুগের পরে ত্রেতাযুগের শুরুর দিন। ত্রেতাযুগ হলো হিন্দুধর্ম অনুযায়ী চতুর্যুগের দ্বিতীয় যুগ। সংস্কৃত ভাষায় ত্রেতা অর্থ তৃতীয়। প্রথম যুগ হলো সিদ্ধ নৈতিকতার সত্যযুগ এবং দ্বিতীয়টি ত্রেতাযুগ। ত্রেতা যুগ চলেছিল ১২,৯৬,০০০ বছর। এই যুগের পালনকর্তা বিষ্ণুর তিন অবতার যথাক্রমে বামন, পরশুরাম ও শ্রীরামচন্দ্র। এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনেই রাজা ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে মর্ত্যে নিয়ে এসেছিলেন। এদিনই কুবেরের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাকে অতুল ঐশ্বর্য প্রদান করেন। কুবেরের এই দিন লক্ষ্মী লাভ হয়েছিল বলে এই দিনে বৈভব-লক্ষ্মীর পূজা করা হয়।

কৌরবদের কাছে পাশাখেলায় হেরে পাণ্ডবরা বারো বছরের জন্য বনবাস এবং এক বছরের জন্য অজ্ঞাতবাসে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁদের বনবাসে থাকার সময়ে আবার কৌরবদের চক্রান্তে দুর্বাসা মুনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে এক রাতে পাণ্ডবদের আশ্রয় গ্রহণ করতে যান। কিন্তু সেই সময় তাঁদের ঘরে কোনো অন্ন ছিল না। ক্ষুধার্ত দুর্বাসা অভিশাপ দেবেন ভেবে ভয় পান পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী। ঠিক সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ এসে হাঁড়ির তলায় লেগে থাকা একটিমাত্র অন্ন কণা খেয়ে নেন। আর তাতেই পেট ভরে যায় দুর্বাসা ও তাঁর শিষ্যদের। দুর্বাসার অভিশাপ থেকে পাণ্ডবদের রক্ষা করেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে। তাই এই দিনকে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। পুরাণ থেকে জানা যায়, অক্ষয় তৃতীয়ার দিনেই পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেজন্যেও এই দিনটি অত্যন্ত শুভ। তিনি দুরাচারী ক্ষত্রিয় নিধনের জন্য একটি পরশু অর্থাৎ কুঠার ধারণ করেছিলেন বলে তাঁর নাম পরশুরাম হয়েছিল। হিন্দু ধর্মালম্বীরা এই দিন নদীতে স্নান করে সূর্যদান, জপ, হোম ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। বেদব্যাস ও গণেশ এই দিনে মহাভারত রচনা আরম্ভ করেন। এই তিথি হতেই পুরীধামে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে রথ নির্মাণ শুরু হয়। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন হিন্দুরা সর্বসুখের অধিকারী হতে এবং মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠবাসের সৌভাগ্যলাভ করতে এই ব্রত পালন করেন। অক্ষয় তৃতীয়ায় হিন্দু শাস্ত্রীয় ব্রত পালনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে নতুন কাপড়, কলসী, যব, ভুজ্জি, তালপাতার পাখা ও গামছা সংগ্রহ করতে হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রথমে যব দিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ পূজা করতে হয়। তারপর ভুজ্জি, জলপূর্ণ কলসী, তালপাতার পাখা, গামছা বা নতুন কাপড় ব্রাহ্মণকে দান করতে হয়। এই দিনে যে কোনো অলঙ্কার কেনা খুবই শুভ বলে মনে করা হয়। দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদ -স্বরূপ স্বর্ণ ও রৌপ্যকে বোঝায় এবং বলা হয় যে কেউ যদি এই দিনে স্বর্ণ ও রৌপ্য বিনিয়োগ করে তবে দেবী লক্ষ্মী সমৃদ্ধি ও সম্পদের আশীর্বাদ করবেন। এই দিনে শুরু হওয়া যে কোনো ব্যবসার উন্নতি হতে বাধ্য এমন বিশ্বাস রয়েছে। অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে গৃহপ্রবেশ করতে কোনো নির্দিষ্ট মুহূর্তের প্রয়োজন নেই। এই দিনে অন্ন দান করলে, গোরুকে খাওয়ালে সেই ব্যক্তির কোনো একটি পাপ ও দোষ দূর হবে। অক্ষয় তৃতীয়ার উপবাস, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সাধনা, দান, জপ পবিত্র বলে বিবেচিত হয়। দেবী লক্ষ্মী এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উপাসনাকারীর ওপর বর্ষিত হয় শ্রীভগবানের আশীর্বাদ। অক্ষয় তৃতীয়াকে মূলত হিন্দু বা সনাতন ধর্মে বিশ্বাসীদের কাছে পালনীয় এক পবিত্র দিন হিসেবে দেখা হলেও জৈন মতে এই দিনটির বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। জৈন মতে, ২৪ জন তীর্থঙ্করের প্রথম হলেন ঋষভদেব এবং শেষ বর্ধমান মহাবীর। জৈন শাস্ত্র থেকে জানা যায়, ঋষভদেব ছিলেন ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা। তাঁর রাজত্বে কোনো দুঃখ-কষ্ট ছিল না। পৃথিবী সেই সময়ে ছিল অগণিত কল্পবৃক্ষে পূর্ণ। এই বৃক্ষের কাছে যা চাওয়া যায়, তা-ই লাভ করা যায়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কল্পতরু বিলুপ্ত হয়ে যায়। মানুষও শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সঙ্কটে পড়তে শুরু করে। সেই অবস্থায় তাঁর প্রজাদের ক্লেশ নিবারণের জন্য ঋষভদেব ছ'টি বৃত্তি অবলম্বনের নির্দেশ দেন। এগুলি অবলম্বন করলে মানুষ জাগতিক ক্লেশ থেকে দূরে থাকবে বলে তিনি বর্ণনা করেন। এগুলি হলো অসি অর্থাৎ রণজীবী, যাঁরা দুর্বলকে রক্ষা করবেন; মসী অর্থাৎ কলমজীবী মানে কবি-দার্শনিক-চিন্তাবিদ; কৃষি অর্থাৎ যাঁরা খাদ্য উৎপাদন করবেন; বিদ্যা অর্থাৎ অন্যকে যাঁরা শিক্ষিত করে তুলবেন। এর পরে বাণিজ্য ও শিল্প।

ঋষভদেব একবার দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় এক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হন। সেখানে নৃত্যগীত চলাকালে এক অপ্সরার মৃত্যু হয়। প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর নৃত্যরতা অপ্সরার আকস্মিক মৃত্যু ঋষভদেবকে বিহ্বল করে তোলে। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং ১৩ মাস নির্জলা উপাবাসে থেকে সত্যানুসন্ধান করে জন্ম-মৃত্যুর অনিত্যতা এবং আত্মার অবিনশ্বরতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। ১৩ মাস অতিক্রান্ত হলে তিনি তাঁর প্রপৌত্র রাজা শ্রেয়াংশের হাত থেকে অঞ্জলি ভরে ইক্ষুরস পান করে উপবাস ভঙ্গ করেন। সেই দিনটি ছিল অক্ষয় তৃতীয়া। সেই কারণে এই দিনটি জৈনরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে থাকেন। এই দিন তারা সন্ন্যাসীদের আহার্য দান করেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে, অক্ষয় তৃতীয়াকে মহাকাশীয় গ্রহ-নক্ষত্রের সারিবদ্ধতার কারণে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। এটি বিশ্বাস করা হয় যে এই সময়ে সূর্য ও চন্দ্র উচ্চ অবস্থানে থাকে, ইতিবাচক শক্তি বাড়ায় এবং পুণ্যময় কাজের প্রভাবকে বাড়িয়ে তোলে। অক্ষয় তৃতীয়া মানেই সমৃদ্ধি, প্রাচুর্য এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উদ্‌যাপন। তার সঙ্গে এই পবিত্র তিথি আমাদের ধার্মিকতা, দানশীলতা ও কৃতজ্ঞতার চিরন্তন মূল্যবোধের কথা মনে করিয়ে দেয়। □

# বাঙ্গালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য শশাঙ্ক থেকে বর্তমান

**প্রবীর ভট্টাচার্য্য**

বঙ্গ-ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখলে একটা বিস্ময়কর উপলব্ধি করা যায় যে, এই ভূমির জীবনধারা স্থির নয়, এটি পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থায় আবর্তিত। বারবার পতন এসেছে, কিন্তু পতনের ভিতর দিয়ে আবার নতুন শক্তির জন্ম হয়েছে। এ কারণেই বঙ্গদেশকে একটি ভৌগোলিক অঞ্চল বলা যায় না, এটি একটি ঐতিহাসিক সৃজনশীলতার ক্ষেত্র। এই ভূমি আধ্যাত্মিকতার ভাবভূমিও। বঙ্গের এই প্রসারিত অতীতকে বিশ্লেষণ করলে অন্তত তিনটি মহাজাগরণ আমাদের স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে— গৌড়াধিপ মহারাজা শশাঙ্ক ও পাল-সেনযুগে সাংস্কৃতিক উত্থান, দ্বিতীয় শ্রীচৈতন্য যুগের মানবিক ও সামাজিক ঐক্যের আন্দোলন, তৃতীয় উনিশ শতকের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণ। বাঙ্গালি সংস্কৃতি বলতে আদপে ক্রম বিকাশশীল এই সাংস্কৃতিক ধারাকেই বোঝায়। উনিশ শতকের জাগরণের ঢেউ শেষ হয়েছে অন্তত ষাট-সত্তর বছর আগে। চতুর্থ একটি নবজাগরণের অপেক্ষায় আমরা সবাই।

মগধে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবসানের পর ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এক অনামি রাজপুরুষ শশাঙ্ক বাহুবল এবং কুশলী বুদ্ধিমত্তায় স্বাধীন গৌড়বঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই হচ্ছেন প্রথম নৃপতি যিনি বাঙ্গালিকে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। তিনিই বঙ্গাব্দের প্রবর্তক। গৌড়ের ইতিহাস থেকে জানা যায়, শশাঙ্ক বারোজন শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণকে গৌড়ে নিয়ে আসেন। তাঁদের দ্বারাই বঙ্গদেশে সুর্যপূজা ও প্রতিমাপূজার প্রবর্তন হয়। ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাসের 'বঙ্গাব্দের আদিবিন্দু সন্ধান' বা নবকুমার ভট্টাচার্য্যের 'বঙ্গাব্দের প্রবর্তক শশাঙ্ক' লেখায় জানা যাচ্ছে, গুপ্ত অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে গৌড়বঙ্গে স্বাধীন রাজত্বের সুচনা ও বঙ্গাব্দের কাল গণনা হয়েছে একই দিনে।

মহারাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বঙ্গদেশে দীর্ঘদিনের অরাজকতা ও মাৎস্যন্যায় পরিস্থিতির অবসানে বাঙ্গালির সম্মিলিত শক্তির কেন্দ্র থেকে বপ্যট নামে এক রণকুশল ব্যক্তির পুত্র গোপালদেবকে সম্রাট পদে সবাই বরণ করলেন। এই সময়ে দেবী চণ্ডী আবির্ভূতা হলেন। বাঙ্গালির শিল্প-সংস্কৃতির এক অনবদ্য ভূমিকা এই সময়ে মানুষ প্রত্যক্ষ করল। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার এক অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে বাঙ্গালি সমাজে। পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহার, ধীমান ও বীতপালের ভাস্কর্য শিল্প এবং তালপাতার পুঁথির চিত্র এ যুগের অন্যতম নিদর্শন। এ সময়ের শিল্পকর্মে প্রভাবিত হয়েছিল নেপাল, তিব্বত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতম্' এবং বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ সম্পদ 'চর্যাপদ' এই সময়কালের। জীমূতবাহনের দায়ভাগ, চক্রপাণির চিকিৎসা সংগ্রহ, কাদম্বরী, কথাসাগর ও স্মৃতি, পুরাণ এবং ব্যাকরণের ওপর টীকা এ যুগের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ

করে। অষ্টম শতকের শেষে বা নবম শতকের গোড়ায় রাজা ধর্মপাল মগধে বিক্রমশিলা মহাবিহার নামে এক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপকদের মধ্যে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, কল্যাণ রক্ষিতের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময়েই বৌদ্ধ-সনাতনী আচার অনুষ্ঠান বহির্ভূত সহজিয়া নামে এক সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। পালরাজদের পর বর্ধমান অঞ্চলে সামন্ত সেনের হাত ধরে সেনবংশের সূচনা। একাদশ-দ্বাদশ শতকে বাঙ্গালি হিন্দু সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ ঘটে এই সময়ে। রাজা বল্লাল সেনের প্রতিষ্ঠিত ঢাকেশ্বরী মন্দির, প্রাচীন কিরাত রাজ্য ত্রিপুরার ঊনকোটি মন্দিরের অপরূপ ভাস্কর্য লক্ষ্য করা যায়। ঢাকেশ্বরী মন্দির ও রাজা বল্লাল সেনকে নিয়ে নানা কিংবদন্তী আজও মানুষের মুখে মুখে। লক্ষণ সেনের সভাকবি জয়দেব এবং ধোয়ী, শরণ, হলায়ুধদের মতো পণ্ডিতদের সাহিত্যকর্ম ওই সময়ের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

সাহিত্য সৃষ্টিতে বাঙ্গালি যুগ যুগ ধরে তাঁদের পারদর্শিতা দেখিয়ে আসছে। এ যাবৎকাল পর্যন্ত বাঙ্গালির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিদের নাম উল্লেখ করলে অবশ্যই বলতে হয় দ্বাদশ শতকে কেন্দুলির কবি জয়দেব, চতুর্দশ শতকে নানুরের কবি চণ্ডীদাস, পঞ্চদশ শতকে মিথিলার কবি বিদ্যাপতি, প্রাক চৈতন্যকালে পঞ্চদশ শতকে ফুলিয়ার কবি কৃত্তিবাস এবং উনবিংশ শতকে নবজাগরণের প্রাণ পুরুষ রবীন্দ্রনাথ।

দ্বাদশ শতকে বখতিয়ার খিলজি বঙ্গদেশে মুসলমানরা আধিপত্য বিস্তার করায় বাঙ্গালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ভাটা পড়ে। এর পুনরুত্থান ঘটে প্রায় তিনশো বছর পর পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের মধ্যে দিয়ে। এইসময় রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবধারায় সমাজে এক নবজাগরণ ঘটে। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেম ভক্তিকেন্দ্রিক এই যুগে কীর্তন গান, নৃত্য, পদাবলী সাহিত্য ও স্থাপত্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনি প্রধান শিল্পরূপ হয়ে ওঠে। জাতপাতহীন ভক্তি আন্দোলন বাঙ্গালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে গভীর ছাপ ফেলে। আজও বাঙ্গালির উদারমনা বৈশিষ্ট্যের মূল কারণ এটিই। শ্রীচৈতন্য জীবনীকার শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, লোচনদাস, নরহরিদাস, যশোরাজ খানের রচনা আজও বাঙ্গালি সাহিত্যের রত্ন। পাড়ায় পাড়ায় কীর্তন গায়কদের সুললিত কণ্ঠে এইসব পদকর্তাদের রচিত পদ রূপমাধুর্যে ভরে ওঠে।

১৮৩৮ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাবের পর তাঁর রচিত বন্দেমাতরম বা আনন্দমঠ উপন্যাস বাঙ্গালিকে জাতীয় চেতনায় জাড়িত করে। আবার এক নবজাগরণের সূচনা হয়। এটিকে বাঙ্গালির নবউন্মেষের তৃতীয় পর্যায় বলা যেতে পারে। অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় রাজা রামমোহন রায় এবং পরবর্তীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ঝড়ের মতো আবর্জনা দূরে সরিয়ে বাঙ্গালি বিশ্বসভায় প্রতিষ্ঠা পেতে সাহায্য করেছে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, কারিগরি শিল্প, সমাজ ভাবনা-– এই সব কিছুতেই বাঙ্গালি অনন্য নজির গড়েছে। এ ছিল এক অসাধারণ বৌদ্ধিক, নৈতিক ও আত্মিক জাগরণ। এই সময়ে বাঙ্গালির দ্বারে শুধু ভারত নয়, বিশ্ব এসেও কড়া নেড়েছে। এ সবই সম্ভব হয়েছে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, স্বামী প্রণবানন্দের মতো যুগপুরুষের সাংস্কৃতিক-আধ্যাত্মিক ভাবধারার কল্যাণে। পরাধীন ভারতে জাতীয়তার চেতনা জাগ্রত করা এবং সমাজকে ইতিবাচক পথে চালিত করার কারিগর হিসেবে এরা কাজ করে গেছেন। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম দিয়ে যদি এই যাত্রাপথের সুচনা হয় তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় বিংশ শতকের প্রারম্ভে সুভাষ-শ্যামাপ্রসাদের আগমন পর্যন্ত এর বিস্তার ছিল।

বিগত প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে বাঙ্গালি সমাজ ক্রমশই ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে। ভুল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সমাজকে বিপথগামী করেছে। উন্নয়নের ধারা চরম নিম্নমুখী। নিম্ন ও মধ্য মেধার প্রাধান্যে সামাজিক জাগরণের সমস্ত পথ বন্ধ। এই সাংঘাতিক সংকট থেকে নিরসনের উপায় কী হতে পারে? গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক পরিবর্তন একটি নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা মাত্র। কিন্তু চাই সামাজিক পরিবর্তন, চতুর্থ পুনর্জাগরণ এখন সময়ের অপেক্ষা। আমরা অধির আগ্রহে রয়েছি তাঁর সেই আহ্বানে—'....রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পুর্ব উদয়গিরিভালে/ গাহে বিহঙ্গম পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।'


## স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

| | | |
|---|---|---|
| Back Cover | (Multi Colour) | Rs. 32,000.00 |
| Front Inside | (Multi Colour) | Rs. 25,000.00 |
| Back Inside | (Multi Colour) | Rs. 25,000.00 |
| Full Page | (Multi Colour) | Rs. 20,000.00 |
| Full Page | (Black & White) | Rs. 15,000.00 |
| Half Page | (Black & White) | Rs. 8,000.00 |
| Qtr. Page | (Black & White) | Rs. 4,000.00 |

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

*যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩*

# অক্ষয় পুণ্যলাভের লক্ষ্যে অক্ষয় তৃতীয়ার মাহাত্ম্য উপলব্ধি গুরুত্বপূর্ণ

**গোপাল চক্রবর্তী**

ভারতবর্ষ তথা বঙ্গদেশীয় হিন্দুদের কাছে অক্ষয় তৃতীয়া একটি বিশেষ তিথি। সৌর বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথি অক্ষয় তৃতীয়া নামে খ্যাত। আচার্য রঘুনন্দনের 'তিথিতত্ত্ব' নামক প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে জানা যায়, অক্ষয় তৃতীয়ায় সত্যযুগের শুরু হয়েছিল। সৃষ্টিকর্তা জনার্দন এই পুণ্য তিথিতে সৃষ্টিকার্য শুরু করেছিলেন। ভগীরথ কঠোর তপস্যার দ্বারা এই পুণ্য তিথিতে স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে মর্ত্যে অবতরণ করিয়েছিলেন। এই শুভ তিথিতে জমদগ্নির পুত্র শ্রীবিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার ক্ষত্রিয় সংহারক পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই জন্য এই দিনটি পরশুরাম জয়ন্তী রূপেও পালন করা হয়। এই তিথিতে কুবেরের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবাদিদেব মহাদেব তাঁকে অতুল ঐশ্বর্য প্রদান করেছিলেন। কুবেরের এই তিথিতে লক্ষ্মীলাভ হয়েছিল বলে অক্ষয় তৃতীয়ায় বৈভব লক্ষ্মীর পূজা প্রচলিত আছে।

এইপুণ্য তিথিতে পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। উচ্চ হিমালয়ে প্রবল শৈত্য প্রবাহের জন্য কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী প্রভৃতি মন্দির শীতের শুরুতে (অক্টোবর মাসে) বন্ধ হয়ে যায়। মন্দির বন্ধ করার সময় পুরোহিত মন্দিরে এক অক্ষয় প্রদীপ জ্বালিয়ে আসেন। দীর্ঘ ছ'মাস পর অক্ষয় তৃতীয়ার (এপ্রিল মাস) পুণ্য তিথিতে মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। আশ্চর্য হলেও সত্যি যে সেই ছ'মাস আগে জ্বালানো প্রদীপ তখনও জ্বলে।

কথিত, এই অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব মহাভারত রচনার সূচনা করেছিলেন। এই তিথিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চন্দন যাত্রা, শ্রীকৃষ্ণকে চন্দন দ্বারা অনুলিপ্ত করার বিধান আছে। মহাভারত অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ এই তিথিতে দ্রৌপদীকে অক্ষয় বস্ত্র দান করেছিলেন। এই তিথিতে দেবী অন্নপূর্ণার জন্ম হয়েছিল বলে একটি মত রয়েছে। এই কারণে এইদিন অন্নপূর্ণা পূজার বিধানও আছে। এইদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দুর্বাসার অভিশাপ থেকে রক্ষা করেছিলেন। ভবিষ্যপুরাণে অক্ষয় তৃতীয়ায় জলদানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটি কাহিনি আছে। নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বীরা একদা শতানীককে বলেছিলেন— পূর্বে আপনি অক্ষয় তৃতীয়ায় জলদানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছিলেন সেই কাহিনি আমরা আবার শুনতে চাই।

শতানীক বললেন— পুরাণকালে বঙ্গদেশে ধর্মকর্ম বিবর্জিত এক ব্রাহ্মণ বাস করত। একদিন তার গৃহে আর এক তৃষ্ণার্ত ব্রাহ্মণ এসে পানীয় জল প্রার্থনা করল। গৃহস্বামী ব্রাহ্মণ বলল— আমার গৃহে জল নেই। অন্যত্র গিয়ে তুমি ইচ্ছেমতো জল পান কর।

এই দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণের স্ত্রী ছিল সুশীলা সুব্রতা ও পতিব্রতা। সে স্বামীকে বলল— এই তৃষ্ণার্ত ব্রাহ্মণকে জল দাও। এই ধন সম্পত্তি ও গৃহাদি কীসের জন্য? আপন উদর পূরণ কুকুরেরাও করে। এই কথা বলে ব্রাহ্মণের স্ত্রী সেই পিপাসার্ত অতিথি ব্রাহ্মণকে বসার জন্য আসন পেতে দিয়ে, পানের জন্য জল দিল। ঘটনাক্রমে সেই দিন ছিল বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথি অর্থাৎ অক্ষয় তৃতীয়া। অতিথি ব্রাহ্মণ জলপানে তৃপ্ত হয়ে আশীর্বাদ করে প্রস্থান করলেন। যথা সময়ে আয়ু শেষ হলে যমদূত এসে পাশবদ্ধ করে সেই পাপাত্মা ব্রাহ্মণকে যমলোকে নিয়ে গেল। তার পাপের অন্ত নেই সর্বোপরি তৃষ্ণার্তকে জল দেয়নি। এই জন্য তার কঠিন শাস্তি হবে।

যমলোকে গিয়ে সেই পাপাত্মা ব্রাহ্মণকে যমদূতেরা যমের সামনে উপস্থিত করলে সে বলে উঠল— ধর্মরাজ, আমি আমার গৃহে এক তৃষ্ণার্ত ব্রাহ্মণকে জল পান করিয়েছি।

যমদূতেরা বলল প্রভু এই কপট ব্রাহ্মণ মিথ্যা কথা বলছে। এ কখনো তৃষ্ণার্ত ব্রাহ্মণকে জল দেয়নি। সারাজীবন শুধু পাপ কর্মই করেছে। আদেশ করুন একে নরকে পাঠিয়ে দিই।

যমদূতের কথা শুনে যমরাজ বললেন— তোমরা শান্ত হও। এই পাপাত্মা নরকবাসের উপযুক্ত। কিন্তু এর ধর্মপরায়ণা ধর্মপত্নী বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে তৃষ্ণার্ত ব্রাহ্মণকে জলদান করে যে পুণ্য অর্জন করেছেন, এই পাপাত্মাও তার ভাগী। সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য, তাই এই দুরাচার নিশ্চিত নরকবাস থেকে মুক্ত। ধর্মপরায়ণা পত্নীর পুণ্যে এর স্বর্গবাস নির্ধারিত হলো।

ধর্মসভার সভাসদগণ তখন সমস্বরে জানতে চাইলেন— প্রভু! এই অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে কী কর্তব্য তা আপনি বিশদে সকলের জন্য ব্যক্ত করুন।

যম বললেন— অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে স্নান-দান তপস্যা, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, পিতৃতর্পণ, ইত্যাদি কর্তব্য। শ্রদ্ধাভরে বিধিসম্মত বিষ্ণুপূজা করলে জন্মান্তরে তার বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। আবার মনুষ্যজন্ম হলেও সে সৎ, দাতা, সদাচারী, ধার্মিক ও পরম বৈষ্ণব হয়। সে জাতিস্মরা ও দয়াশীলা ভার্যা লাভ করে।

উত্তরকালে উভয়ে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্ত হয়। এই ভাবে শতানীক তার কাহিনি শেষ করলেন।

অনেকে এদিন জলপূর্ণ কুম্ভ দান করেন। মহিলারা অক্ষয় তৃতীয়া ব্রতানুষ্ঠান প্রসঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণ পূজা, জলপূর্ণ কুম্ভ ও ভোজ্যদান করে থাকেন। হিন্দুদের বিশ্বাস এই পুণ্য তিথিতে কোনো শুভকর্ম সম্পাদন করলে তার ফল হয় চিরন্তন, অক্ষয়।

পুরাণ অনুসারে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন অক্ষয় তৃতীয়ার তাৎপর্য কী? শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বলেছিলেন যে, এই তিথি অত্যন্ত সৌভাগ্যদায়ক। অক্ষয় তৃতীয়ার দ্বিপ্রহরের আগে স্নান করে যারা জপ, তপ, হোম, শাস্ত্রপাঠ, পিতৃতর্পণ, দান ক্রিয়াদি সম্পন্ন করেন তাঁরা আশ্চর্য সৌভাগ্য লাভ করেন। □

# বাম ও ইসলামি কট্টরপন্থা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ

**অমিতকুমার চৌধুরী**

বাম ও ইসলামি কট্টরপন্থা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। তা পুনরায় প্রমাণ হলো বর্তমান ইরানের চলমান ঘটনায়। ইরানের মোল্লাবাদী, নারীবিরোধী সর্বোচ্চ শক্তিধর মজহবি নায়ক খোমেইনি নিহত হয়েছেন আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ আক্রমণে। আমেরিকা ও ইজরায়েলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বিশ্ববাসীর নিকট সুবিদিত, তা বলাবাহুল্য। কোনো স্বাধীন সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অন্য কোনো দেশের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়। আমেরিকা সারা বিশ্বে দাদাগিরি করে নিজের স্বার্থে, তাও ভীষণ সত্য, যা মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু ইজরায়েলের আক্রমণ দাদাগিরির জন্য নয় বরং তার দেশের সুরক্ষা, নিরাপত্তার জন্য।

মধ্যপ্রাচ্যে বর্তমানে ইরান একটি শিয়া সম্প্রদায় গরিষ্ঠ ইসলামি দেশ। অতীতে সেই দেশটার নাম ছিল পারস্য। তারা সকলে ছিল পারসিক মতাবলম্বী। জরথুষ্ট্র অনুগামী। পারসিকরা ছিলেন অগ্নি উপাসক। সিংহ ও সূর্য তাদের পতাকায় দেখা যেত। তাদের সংস্কৃতি বহুলাংশে হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে মেলে। পরবর্তীকালে ইসলামি আক্রমণের ফলে বহু মানুষ নিহত হন, কিছু মানুষ দেশত্যাগ করে প্রাণ বাঁচান, অবশিষ্টরা অসহায়ের মতো ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ভয়াবহ ইসলামি শাসনের দমবন্ধ করা পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে তারা বলতে শুরু করেছেন আমরা মুসলমান নই,আমরা পারসিক। অর্থাৎ শিকড়ের সন্ধানে নেমেছে ইরানিরা। ইরান একটা উন্নত সভ্য দেশ ছিল। ইরানের শাহ রেজা পহলবি একজন আধুনিক পাশ্চাত্যপন্থী মানুষ ছিলেন। সেখানে তিনি আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। নারীদের প্রচুর স্বাধীনতা ছিল। তারা নিজেদের ইছামতো পোশাক পরিধান করতেন। এক মুক্ত পরিবেশ ছিল ইরানীয় সমাজে। কিন্তু ১৯৭৯ সালে গোঁড়া ইসলামি নেতা আয়াতুল্লা খোমেইনি ইসলামি বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে ইরানকে মধ্যযুগীয় বর্বরতার দিকে ঠেলে দেন । মুক্ত সমাজকে বদ্ধ করে দিলেন, নারীকে বোরখা, হিজাবে বন্দি করে ফেলা হলো। শুধু তাই নয়, হিজাব পরিহিতা ২২ বছর বয়সি মাসহা আমিনির একটু চুল দেখা গিয়েছিল বলে খোমেইনির নীতি-পুলিশ সেই ফুটফুটে ফুলের মতো নিষ্পাপ মেয়েটিকে নির্মম ভাবে হত্যা করে। দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠে সমগ্র ইরান জুড়ে। বহু নারী নিজেদের চুল কেটে ফেলে, হিজাব, বোরখায় অগ্নি সংযোগ করে তীব্র প্রতিবাদ করেন। পুরুষেরাও প্রতিবাদ করলে পুলিশ প্রায় ৬৮ জন শিশু-সহ ৫৫১ জনকে গুলি করে হত্যা করে। ২০২৫-২৬ সালে খোমেইনি প্রায় তিন থেকে ষোলো হাজার মানুষকে হত্যা করে বলে সংবাদসূত্রে জানা যায়। তার মধ্যে বহু নারীও ছিলেন। তাঁদের ক্ষোভ এতো বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে যে, এক কিশোরী কন্যা

**দীপু চন্দ্র দাসের মতো এক অসহায়, দরিদ্র অন্ত্যজ শ্রেণীর হিন্দুকে প্রকাশ্য স্থানে জেহাদিরা জ্যান্ত পুড়িয়ে হত্যা করার পরও বামেরা নির্বিকার। বাংলাদেশ এতো কাছে, তবু তারা প্রতিবাদহীন। আর শত যোজন দূরে গাজা প্যালেস্তাইন, তেহেরানের জন্য তাদের কত চিন্তা!**

খোমেইনির ছবিতে অগ্নিসংযোগ করে সেই আগুন দিয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে— এই দৃশ্য বিশ্ববাসী দেখেছে।

খোমেইনির মৃত্যুতে ইরানে বহু মানুষ আনন্দে মেতে উঠেছে। আবার কিছু মানুষ তার মৃত্যুতে ক্ষোভ প্রদর্শন করছে এবং আমেরিকা ও ইজরায়েলের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। রীতিমতো যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আমেরিকা ইরান থেকে বহুদূর হওয়ায় সরাসরি আমেরিকাকে আক্রমণ করতে পারছে না। কিন্তু ইজরায়েলকে আক্রমণ করছে। ইজরায়েলেও পালটা আক্রমণ করছে। ইরান প্রতিবেশী কিছু ইসলামি দেশকেও আক্রমণ করছে। ফলে হতাহত হচ্ছে বহু মানুষ। বহু সম্পত্তি ধ্বংস হচ্ছে। তেলের সরবরাহ বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। ভারতেও এর প্রভাব ভবিষ্যতে পড়তে পারে। ইরান দেশটা ভারতের কট্টর বিরোধী না হলেও ভারতের সঙ্গে তার কৌশলগত বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে। ভারতকে সতর্ক হয়ে কূটনৈতিক স্তরে অগ্রসর হতে হবে। ইতিমধ্যে ভারত খোমেইনির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে।

ভারতে দেখা যাচ্ছে কিছু মুসলমান ও বামপন্থী দল আমেরিকা ও ইজরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে। প্রথমত, খোমেইনি শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত মুসলমান যা সুন্নি মুসলমানদের দৃষ্টিতে কাফের, যেমন হিন্দু, ইহুদি ও খ্রিস্টান। তাহলে কাফেরদের জন্য এতো কান্নাকাটি কেন? কই ,কাশ্মীরের শিয়া মুসলমানরা কাশ্মীরের হিন্দুদের হত্যার কোনো প্রতিবাদ তো করেইনি বরং কাফের হিন্দুদের হত্যা করা হচ্ছে বলে নীরব থেকেছে। আর যদি মুসলমানরা ভেবে থাকেন যে বিশ্বের সমস্ত মুসলমানই তাদের ভাই, তাই তাদের পাশে আমাদের দাঁড়ানো উচিত, তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে, ভারতে মুসলমানদের প্রতিবেশী হিন্দুরা তাদের শত্রু? ভারতের মুসলমানদের বুঝতে হবে যে

প্রতিবেশী হিন্দুরাই তাদের সাহায্য করবে, হিন্দুরাও মুসলমানদের সাহায্য চাইবে বিপদে পড়লে। ইরানের মুসলমানরা কখনই ভারতের মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। এছাড়া ইসলামের নামে সমস্ত ইসলামি দেশ এক হতে পারে না। কেননা প্রতিটি ইসলামি দেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান, সংস্কৃতি, স্বার্থ আলাদা। তাই শুধু মজহবের নামে বিশ্বের সমস্ত মুসলমান এক হতে পারে না। এই যুদ্ধে দেখা যাচ্ছে ইরান বেশকিছু মুসলমান দেশকেও আক্রমণ করেছে। কোথায় ইসলামের বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব? ইসলামের পবিত্র স্থান সৌদি আরব যেখানে সারা পৃথিবীর মুসলমানরা হজ করতে যায়, ইরান সেই দেশকেও আক্রমণ করেছে। মুসলমানরা ইরানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে না কেন? ভারতে বামেদের অবস্থাও তাই। বামেরা আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদকে এক নম্বর শত্রু বলে মনে করে। ইরানের বিপরীতে আমেরিকা আছে তাই এতো বিরোধিতা? সঙ্গে দোসর ইজরায়েল,তাই তারও বিরোধিতা। বামেদের ইজরায়েল বিরোধিতার অন্য ও প্রধান কারণ, ইজরায়েল লড়াই করছে তার প্রতিবেশী সব শত্রু মুসলমান দেশের বিরুদ্ধে, যারা মধ্যপ্রাচ্যে ইজরায়েলের অস্তিত্বই স্বীকার করতে চায় না। বামেরা সর্বদা মুসলমানদের পক্ষ নেয়, তারা যতই অমানবিক আচরণ করুক না কেন। ভারতে মুসলমান ভোট প্রচুর। সেই মুসলমান ভোটের লোলুপতায় তারা চোখ-কান বন্ধ করে, নীতি বিসর্জন দিয়ে সর্বদা মুসলমানদের পক্ষ নেয়। বামেদের মুসলমানদের পক্ষ নেওয়া কোনো আদর্শগত অবস্থান নয়, এটা তাদের ভোট পাওয়ার কৌশল। রাজনীতিতে খড়কুটোর মতো মুসলমান ভোট ধরে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে যা পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম আইএসএফ, মিম, জেইউপি (জাপ)-এর মতো মুসলমান দলগুলোর সঙ্গে আঁতাত করে।

বামেরা যদি এতোই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হয় তবে চীনের তিব্বত দখল নিয়ে তারা চুপ কেন? রাশিয়া বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর

**ইরানে প্রগতিশীল খোলামেলা নারীদের বোরখা পরতে বাধ্য করা হয়, মহিলাদের উপর বিভিন্নধ বিধিনিষেধ আরোপ করলেও বামেরা সেই জেহাদি নারীবিরোধী খোমেইনির মৃতু তে অশ্রু বিসর্জন করে। কেন?**

বিভিন্ন দেশ আক্রমণ করেছে, তখনও বামেরা ছিল প্রতিবাদহীন। গুজরাটে কয়েকশো জেহাদি লোকের হত্যায় বামেরা ভারত ব্যাপী তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল। অথচ রাশিয়ার স্তালিন প্রায় দুই কোটি মানুষ হত্যা করেও তাদের কাছে মহানায়ক। চীন, তিব্বত, জিনজিয়াঙে মাও-সে-তুং প্রায় দশ কোটি লোক হত্যা করেও বামেদের কাছে সমালোচনার পাত্র নয়। রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেন আক্রমণ করে এবং বছর পেরিয়ে গেলেও আজও যুদ্ধ থামার কোনো লক্ষণ নেই, বলপূর্বক ইউক্রেনের জমি দখল করে নিয়েছে, তবু বামেরা পুতিনের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামে না। বামেরা সঙ্ঘ ও বিজেপিকে নারী বিরোধী, মনুবাদী, ব্রাহ্মণ্যবাদী দল বলে অভিযোগ করে থাকে। কিন্তু ইরানের মজহবি নেতা খোমেইনির নারীবিরোধী কার্যকলাপ তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। ইরানে প্রগতিশীল খোলামেলা নারীদের বোরখা পরতে বাধ্য করা হয়, মহিলাদের উপর প্রচুর বিধিনিষেধ আরোপ করলেও বামেরা সেই জেহাদি নারীবিরোধী খোমেইনির মৃতু তে অশ্রু বিসর্জন করছে কেন? প্রতিবেশী বাংলাদেশে অমানবিক হিন্দু নিধন দেখেও না দেখার ভান করেন। দীপু চন্দ্র দাসের মতো এক অসহায়, দরিদ্র অন্ত্যজ শ্রেণীর হিন্দুকে প্রকাশ্য স্থানে জেহাদিরা জ্যান্ত পুড়িয়ে হত্যা করার পরও বামেরা নির্বিকার। বাংলাদেশ এতো কাছে, তবু তারা প্রতিবাদহীন। আর কত দূরে গাজা প্যালেস্তাইন, তেহেরান, তার জন্য কত তাদের চিন্তা! বামেরা বাই-ফোকাল চশমা পড়ে কিন্তু চশমার পাওয়ার ভুল থাকায় দূরের বস্তু দেখতে পায় কিন্তু কাছের বস্তু দেখতে পায় না। ওদের চশমার পাওয়ার ঠিক করা প্রয়োজন। আফগানিস্তানের বর্তমান সরকার নারীবিরোধী। মহিলাদের সব অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য, তাদের বোরখার ভিতরে বন্দি করে রাখার জন্য এই সরকারের বিদেশমন্ত্রীকে ভারত সরকার কেন আমন্ত্রণ করেছে তার জন্য ভারত সরকারের সমালোচনা করেছেন জনৈক বাম সাংবাদিক। আর ইরানের খোমেইনি সেই একই দোষে দুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বামেরা তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলে না। চীনে উইঘুর মুসলমানদের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচারেও বামেরা নির্লজ্জ নীরবতা পালন করে চলেছে।

ইসলামের এক নম্বর শত্রু হচ্ছে ইহুদিরা। এই ইহুদিদের নিজস্ব দেশ ইজরায়েল। তারা নিজ ভূমি থেকে প্রায় দুই হাজার বছর আগে বিতাড়িত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছিল। সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৯৪৮ সালে তারা তাদের মাতৃভূমি ফিরে পায়। এই ইহুদি জাতি অত্যন্ত ধনী ও মেধাবী। ৩১৬ টি নোবেল পুরস্কার পেয়েছে তারা। বিশ্বের অধিকাংশ বড়ো কোম্পানির মালিক ইহুদিরা। অর্থাৎ ধন ও শিক্ষায় এক শ্রেষ্ঠ জাতি। কিন্তু পৃথিবীতে তাদের জন্যসংখ্যা মাত্র দেড় কোটি যা ভারতের অখণ্ড মেদিনীপুর জেলার জন্যসংখ্যার মতো আর আমাদের উত্তবঙ্গের থেকেও ছোট। তবু এদের বাঁচতে দেবে না মুসলমানরা, যাদের বিশ্বে মোট ৫৭ টি দেশ আছে,জনসংখ্যা প্রায় ২০০ কোটি। ইজরায়েল তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে লড়াই করে চলেছে তা ভারতের কাছে উদহারণ হয়ে থাকুক। ভারত- ইজরায়েলের বন্ধুত্ব অটুট থাকুক, কারণ ইজরায়েলের মতো ভারতও আটশো বছরের ইসলামিক ক্ষত বহন করে চলেছে। □

# বাঙ্গালিয়ানা কাম্য কিন্তু ভারতীয়ত্বকে অস্বীকার করে নয়

**সৌম্য চক্রবর্তী**

আমি একজন গর্বিত বাঙ্গালি। আমার ভাষা বাংলা, আমার সংস্কৃতি বহুমাত্রিক, আমার ইতিহাস সংগ্রাম, সৃজনশীলতা ও মানবিকতার এক দীর্ঘ ধারাবাহিকতা। কিন্তু এই পরিচয়ের মধ্যেই আমি আরেকটি বৃহত্তর সভ্যতাকে ধারণ করি; আমি একজন ভারতীয়। এই দুই পরিচয় একে অপরের পরিপূরক; পরস্পরবিরোধী নয়। অথচ বর্তমান সময়ে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, যেখানে কিছু রাজনৈতিক দল সচেতনভাবে বাঙ্গালি ও অবাঙ্গালির মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। এই প্রবণতা শুধু সমাজে অশান্তি বাড়ায় না, বরং দেশের জাতীয় ঐক্য ও গণতান্ত্রিক চেতনাকে দুর্বল করে।

ভারতবর্ষকে বুঝতে হলে তার বৈচিত্র্যকে বুঝতে হবে। এই দেশ হাজারো ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও ঐতিহ্যের এক অসামান্য সম্মিলন। এখানে যেমন বাংলা ভাষার মাধুর্য রয়েছে, তেমনি তামিলের প্রাচীনতা, পাঞ্জাবির প্রাণশক্তি, গুজরাটির বাণিজ্যবোধ, মারাঠির গৌরব— সব মিলিয়ে ভারত এক বিশাল সাংস্কৃতিক মহাসমুদ্র। এই বৈচিত্র্যই ভারতের শক্তি, ভারতের পরিচয়ের মূলভিত্তি। 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' বা 'ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য' শুধু একটি স্লোগান নয়, এটি ভারতের আত্মার বাণী।

বাঙ্গালি পরিচয় এক গর্বের উৎস। সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, বিজ্ঞান; সব ক্ষেত্রেই বাঙ্গালির অবদান অসামান্য। কিন্তু এই গর্ব কখনোই অন্যকে ছোটো করার বা দূরে সরিয়ে দেওয়ার কারণ হতে পারে না। বরং এই গর্ব বাঙ্গালিকে আরও উদার, আরও মানবিক করে তুলবে;এটাই হওয়া উচিত। যখন আমরা নিজেদের পরিচয়কে অন্যের বিরুদ্ধে দাঁড় করাই, তখন সেটি গর্ব নয়, বরং সংকীর্ণতা হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে, কিছু রাজনৈতিক দল মানুষের আবেগকে ব্যবহার করে বিভেদের রাজনীতি করছে। তারা ভাষা, অঞ্চল ও সংস্কৃতির পার্থক্যকে বড়ো করে দেখিয়ে মানুষের মধ্যে সন্দেহ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায়। 'বাঙ্গালি বনাম অবাঙ্গালি'—এই বিভাজনমূলক ধারণা তৈরি করে তারা সমাজকে দ্বিখণ্ডিত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে, এই ধরনের রাজনীতি কারোরই মঙ্গল সাধন করে না। এটি শুধু অশান্তি, সংঘাত ও সামাজিক বিচ্ছেদের মানসিকতা সৃষ্টি করে ।

ইতিহাস আমাদের শেখায় যে, যখনই আমরা বিভক্ত হয়েছি, তখনই আমরা দুর্বল হয়েছি। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বিভিন্ন ভাষা ও প্রদেশের মানুষ একসঙ্গে লড়াই করেছিলেন। কেউ তখন বলেননি, 'আমি আগে বাঙ্গালি' বা 'আমি আগে পঞ্জাবি'। সবার পরিচয় ছিল একটাই—'আমি ভারতীয়'। সেই ঐক্যের শক্তিতেই আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আজ যদি আমরা সেই ঐতিহ্য ভুলে যাই, তাহলে তা হবে আমাদের ইতিহাসের প্রতি অবিচার।

একটি দেশের শক্তি শুধু তার সামরিক ক্ষমতা বা অর্থনৈতিক বিকাশই নয়, বরং তার সামাজিক ঐক্য ও পারস্পরিক বিশ্বাসে নিহিত। যদি মানুষ একে অপরের প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে, যদি সমাজে বিভাজন তৈরি হয়, তাহলে সেই দেশের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। ভাই আমাদের উচিত এমন সব চিন্তা ও কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকা, যা সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে।

বাঙ্গালি হিসেবে আমাদের দায়িত্ব শুধু নিজের সংস্কৃতিকে ভালোবাসা নয়, বরং অন্য সংস্কৃতির প্রতিও সম্মান দেখানো। সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা গড়ে তোলা আমাদের কর্তব্য। কারণ তারা আমাদের শত্রু নয়, তারা আমাদেরই সহ-নাগরিক। একই দেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের অধিকার, দায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ একসূত্রে গাঁথা।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, জাতীয় পরিচয় ও প্রাদেশিক পরিচয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। আমরা যেমন বাঙ্গালি, তেমনি আমরা ভারতীয়। এই দুই পরিচয়কে একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো ভুল। বরং এই দুই পরিচয় একটি জাতিকে সমৃদ্ধ করে। একজন বাঙ্গালি যখন ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে, তখন সে শুধু নিজের রাজ্যের নয়, গোটা দেশের গৌরব বৃদ্ধি করে।

বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাবও এই বিভেদের প্রসারে একটি বড়ো ভূমিকা রাখছে। ভুয়ো খবর, উত্তেজনামূলক পোস্ট ও বিভাজনমূলক প্রচার মানুষের মধ্যে ভুল ধারণা সৃষ্টি করছে। তাই আমাদের সচেতন হতে হবে। কোনো তথ্য বিশ্বাস করার আগে তা যাচাই করা এবং অযথা উত্তেজিত না হওয়া;এই দায়িত্ব আমাদের সকলের।

শিক্ষা ও সচেতনতা এই সমস্যার অন্যতম সমাধান। যদি মানুষ বুঝতে পারে যে বিভেদ তাদের কোনো লাভ এনে দেয় না, বরং ক্ষতি করে, তাহলে তারা এই ধরনের রাজনীতি থেকে দূরে থাকবে। একজন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্য হলো মানুষের মধ্যে ঐক্য, সহমর্মিতা ও মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা ।

আমরা আগে ভারতীয়, তারপর বাঙ্গালি-- এই চেতনা শুধু একটি বাক্য নয়, এটি আমাদের অস্তিত্বের মূল ভিত্তি হওয়া উচিত। বিভেদের রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করে ঐক্যের পথেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। কারণ ঐক্যই শক্তি, আর বিভেদই দুর্বলতা। আমরা যদি একসঙ্গে থাকি, তাহলে কোনো শক্তিই আমাদের অগ্রগতিকে থামাতে পারবে না।

# সুপার মুন

**প্রশান্ত কুমার মণ্ডল**

পৃথিবী তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তনের ফলে যখন চাঁদের একেবারে কাছাকাছি অবস্থান করে, তখন স্বাভাবিকভাবে চাঁদকে বড়ো দেখায়। যখন কাছাকাছি অবস্থান হয়, তখন পূর্ণিমা তিথিতে পর্যবেশিত হয় ঠিক তখনই তাকে উজ্জ্বল দেখায় এই অবস্থাকে 'সুপার মুন' আখ্যা দেওয়া হয়। সুপার মুন হলো বৃহৎ পূর্ণিমায় অতিকায় চাঁদ, ইহা মহাকাশে পৃথিবীর একটি মহাজাগতিক বিস্ময়। পৃথিবীর আবর্তনের ফলে যখন চাঁদের একেবারে কাছাকাছি অবস্থান করে তখন স্বাভাবিকভাবে চাঁদকে বড়ো দেখায়।

প্রতি বছর ১০-১১টি পূর্ণিমার চাঁদের মধ্যে সাধারণত ৩টি বা ৪টি সুপার মুন হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। একই মাসে ২টি পূর্ণিমা হলে দ্বিতীয় পূর্ণিমায় (ব্লু মুন) চাঁদ ও পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি (সুপার মুন) এবং সেই দিনেই পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ ঘটে। এই ত্র্যহস্পর্শকে পশ্চিমি দুনিয়ায় 'সুপার মুন' বলে। ১৯৮২ সালের ৩০ ডিসেম্বরের পরে ভারত-সহ এই এশিয়া মহাদেশ থেকে এই ঘটনা দেখা গিয়েছিল প্রথম। সাম্প্রতিক পূর্ণাঙ্গ সুপার মুন ১৫ নভেম্বর ২০২৪ সালে দেখা যায়। পরবর্তী 'সুপার মুন' ৭ অক্টোবর ২০২৫ সালে দেখা গেছে। তারপর ২০২৬ সালে দু'বার— জানুয়ারি মাসে দেখা গেছে এবং নভেম্বর মাসে দেখা যাবে। পরের বছর ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে দেখা যাবে ।

ব্লু মুন মানে নীলচে চাঁদ নয়। পূর্ণগ্রাস গ্রহণে লাল রশ্মির প্রতিসরণের ফলে চাঁদকে লালচে দেখায়, আর 'সুপার মুন' শব্দটির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। পৃথিবীকে পাক খেতে খেতে চাঁদ একবার কাছে এবং একবার দূরে চলে যায়। পৃথিবীর নিকটতম অবস্থানকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পেরিগি বলা হয়। আর যখন পৃথিবী চাঁদ থেকে বেশি দূরত্বে অবস্থান করে তখন তাকে 'অ্যাপোজি' বলা হয়। পেরিগিতে চাঁদের অবস্থানকালে চাঁদকে ১৪ শতাংশ পর্যন্ত বড়ো ও ৩০ শতাংশ উজ্জ্বল দেখায়। একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে কাছের পূর্ণ 'সুপার মুনটির' দেখা মিলবে ৬ ডিসেম্বর ২০৫২ সালে। এই সুপার মুন কথাটির জনক পশ্চিমি জ্যোতিষী রিচার্ড 'নোলে'। তিনি ১৯৭৯ সালে কথাটির প্রচলন করেন।

২০১১ সালে জাপানের সুনামির আটদিন পরেই দেখা গিয়েছিল। ২০১১ সালে গুজরাটের ভুজে ভূমিকম্পের মাসেই হয়েছিল চন্দ্রগ্রহণ। যদিও বিজ্ঞান কাকতালীয় যোগের কথা বিশ্বাস করে না। খড়্গপুর আইআইটি-র ভূ-বিজ্ঞানী শঙ্করনাথ বলেন— এ দিনই ভূমিকম্প হয়েছে, এইরূপ ঘটনার দিনে আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পার্বত্য এলাকায় যা রিখটার স্কেলে ধরা গিয়েছিল ৬.২। তাতে কাশ্মীরে নির্মীয়মাণ সেতুর গার্ডার ভেঙে পড়ে। কম্পন অনুভূত হয়েছিল রাজধানী দিল্লিতেও। যেখানে আরব ইউরোপীয় এবং ভারতীয় পাতের সংযোগ স্থলে একটি বড়ো ফল্ট বা চ্যুতি আছে চাঁদ এবং সূর্যের অভিকর্ষীয় টানের কোনো পাতের উপর প্রভাব পড়তে পারে না। তবে সত্যেন্দ্রনাথ বোস সেন্টার (সল্টলেক) ফর ফিজিক্স বেসিক সায়েন্স অ্যাসট্রো ফিজিক্সের অধ্যাপক সন্দীপ চক্রবর্তীর মতে চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদও সূর্যের মাঝে অবস্থান করে পৃথিবী দু'দিক থেকে অভিকর্ষ বল প্রভাবিত হওয়ায় ভূগর্ভে যে স্থানগুলিতে শক্তি সঞ্চিত থাকে তা মুক্ত হয়ে পড়তে পারে।

মার্কিন ভূতত্ত্ব গবেষণা সংস্থার এক পত্রের বিবৃতিতে জানা যায় যে, চাঁদ ও সূর্যের অভিকর্ষ বলের প্রভাবে সাগরের জলে জোয়ার পরিলক্ষিত হয়, উচ্চতা বদল হয় সমুদ্র গর্ভের। 'সাবডাকসন' জোনে চাপ বদল হতে পারে। এর জন্য ভূমিকম্প হয়েছে এমন কোনো প্রমাণ মেলেনি। □

# পাখির বাসা

**দেবদাস কুণ্ডু**

—তুমি কেন কাঁদছ আমি বুঝতে পারছি না। সরমা বলল।

—তুমি জানালাটা জাল দিয়ে ঘিরে দেবে তাই আমি কাঁদছি। বুবাই উত্তর দিল।

—বারান্দার কারিপাতা ও তুলসীগাছের সব পাতা চড়ুইপাখি খেয়ে নিচ্ছে, তাই ঘিরে দেব। সরমা বলল। একটু থেমে আবার বলল, এতে তোমার কী অসুবিধা? তুমি তো বারান্দা থেকে ঘুড়ি উড়াও না। তুমি ছাদে গিয়ে উড়াও। তাহলে তোমার কান্নার কারণ কী?

—কারণ আছে মা!

—সেটা আমাকে খুলে বলো, তবে না আমি বুঝবো?

—বারান্দার পেছনে একটি প্লাস্টিকের বালতি ঝুলিয়ে রেখেছো তুমি। তাতে নারকোলের ছোবা রাখা আছে।

—হ্যাঁ, আছে, কী হয়েছে তাতে?

—ওই বালতির ভেতরে খড়কুটো দিয়ে বাসা বানিয়েছে দুটো চড়াইপাখি। তাতে ডিম পেড়েছিল, এখন ডিম ফুটে চারটে ছানা হয়েছে। সারাদিন পাখিদুটো ওদের ছানার মুখে খাবার দিয়ে যায়। তুমি যদি জাল দিয়ে বারান্দা ঘিরে দাও, তাহলে চড়াইদুটো আর ছানাদের খাবার দিতে পারবে না। মারা যাবে ছানাগুলি।

—তাই! কিন্তু বালতি ওখান থেকে সরাতেই হবে।

—বালতিটা সরিও না মা। ওরা কোথায় বাসা বাঁধবে? এখানে আগে ছোটোমতো জঙ্গল ছিল, সেই জঙ্গল কেটে আমাদের এই আবাসন হয়েছে। এখন ওরা কোথায় যাবে?

—তাই বলে গাছের সব পাতা খেয়ে ফেলবে?

—শোনো মা, আগে নাকি ঘরে ঘরে ঘুলঘুলি থাকতো। তাতেই চড়াই পাখি বাসা বাঁধতো। এখন তো কোনো বাড়িতে ঘুলঘুলি নেই। ওরা কোথায় যাবে? ওরা তো শেষ হয়ে যাবে! সেটা কি ভালো মা?

সরমা বারান্দায় এসে বালতিটা নামিয়ে দেখে, সত্যিই তুলোর মতো চারটি ছানা। লালঠোঁট হাঁ করে চিঁ চিঁ করে ডাকছে। আর বাইরে চড়াই দুটো মুখে খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছে।

ঘরে চলে এল সরমা। বুবাই বলল, তুমি ওইদুটি গাছকে ঘরের জানালায় রেখে মশারির নেট দিয়ে ঘিরে দাও মা।

সরমা ছেলের বুদ্ধি ও মমতার পরিচয় পেয়ে খুব খুশি হলো। বুবাই বলল— মা, পাখিরা আমাদের বন্ধু। ওরা প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে, তাই ওদের রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। □

জাতীয় উদ্যান

# নকরেক

মেঘালয় রাজ্যের পশ্চিম গারো পাহাড় জেলায় অবস্থিত নকরেক জাতীয় উদ্যান। উদ্যানটি পশ্চিম গারো পাহাড় জেলার তুরা পর্বত থেকে ২ কিলোমিটার দূরে রয়েছে। এই উদ্যানের বিস্তৃতি ৪৭.৪৮ বর্গকিলোমিটার। এই উদ্যান বন্যপ্রাণীর নিরাপদ আশ্রয়স্থল। লালাপাণ্ডা এই উদ্যানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। এছাড়া

রয়েছে হুলক গিবন, হাতি, চিতাবাঘ ও মেঘলা চিতা, বনবেড়াল, সেরো, ধীর লরিস, উড়ন্ত কাঠবেড়ালি, বন্য মহিষ, বিভিন্ন প্রজাতির বাঁদর। পাখির মধ্যে ধনেশ, তিতির, ময়ূর, সবুজ পায়রা প্রভৃতি। এখানে অজগর-সহ বিভিন্ন প্রজাতির সাপ ও টিকটিকি দেখতে পাওয়া যায়। এই উদ্যান ভ্রমণের সেরা সময় হলো অক্টোবর থেকে মে মাস।

## এসো সংস্কৃত শিখি-১০৮

**কদা** দ্বারা প্রশ্ন
('কখন' দ্বারা প্রশ্ন)

**অভ্যাসং কুর্ম:** –

ভবান কদা উত্তিষ্ঠতি?
আপনি কখন ওঠেন?
ভবতি কদা বিদ্যালয়ং গচ্ছতি?
আপনি কখন বিদ্যালয়ে যান?
ভবত্বা:(স্ত্রী) গৃহে কদা পূজা অস্তি?
আপনার (স্ত্রী) বাড়িতে কখন পূজা আছে?
শনিবাসর: কদা অস্তি?
শনিবার কখন আছে?
সূর্যোদয়: কদা ভবতি?
সূর্যোদয় কটায় হয়?

**কদা** দ্বারা প্রশ্নং কুর্বন্তু।
'কখন' দিয়ে প্রশ্ন করার চেষ্টা করব।

## ভালো কথা

# রামনবমীর শোভাযাত্রা

গত ২৭ মার্চ সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের কাছে হনুমান মন্দির থেকে শ্রীরামনবমী উপলক্ষ্যে এক বিশাল শোভাযাত্রার আয়োজন করেছিল শ্রীরামনবমী উদ্‌যাপন সমিতি। প্রতি বছরই আমরা তাতে অংশগ্রহণ করি। এবারও আমি, আমার মা-বাবা, দিব্য ও ওর মা, দেবুদা, সুকেশদা, কুণালদা, অংশুদা, ভরতদা, সহনদা, সৈকতদা, অঙ্কিতদা, নীলদা, সুকু, বাবাইদা, কৌশিকদা-সহ অনেকেই ছিলাম। শোভাযাত্রা শুরু হলে শ্রীরাম পতাকা লাগানো ৫০টি মোটরসাইকেল সবার আগে চলতে লাগল। অনেক সুসজ্জিত ট্যাবলো ছিল। তাতে কোনোটাতে শ্রীরাম-সীতা। কোনোটাতে বিশাল হনুমানের মূর্তি, কোনোটাতে রামগানের দল ছিল। হাজার হাজার মানুষ, মা-বোনেরা সেই শোভাযাত্রায় হাঁটছিল। রাস্তার দু'ধারে শয়ে শয়ে মানুষ দাঁড়িয়ে আমাদের উপর ফুল ছড়াচ্ছিল। কোথাও জল, মিষ্টি, লস্যি, কোল্ড ড্রিংকস দিচ্ছিল। বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করতে করতে শোভাযাত্রা ঠনঠনিয়া কালীমন্দিরের পাশে শ্রীরামমন্দিরে এসে শেষ হলো। আমরা সারা রাস্তা বাজনার তালে তালে নাচছিলাম। এবারও খুব আনন্দ হলো।

**দীপমাল্য সাউ, ষষ্ঠ**শ্রেণী, রাধামাধব সাহা লেন, কল-৭।

*তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।*

## কবিতা

# এসো হে বৈশাখ

**রিদ্ধিমা শাসমল, নবমশ্রেণী,** আরামবাগ বিবেকানন্দ অ্যাকাডেমি, আরামবাগ, হুগলী।

চৈত্র শেষে পাতা ঝরে
এল নতুন বছর,
আমের গাছে নতুন আম
কালবৈশাখির ঝড়।
নতুন বছর করতে বরণ
পাখি ডাকছে সুরে,
এগাছ-ওগাছ ঘুরে ঘুরে
আনন্দেতে উড়ে।

গ্রামে গ্রামে বসছে গাজন
হবে চড়ক মেলা,
মাটির পুতুল কিনবে খুকু
খেলবে বিকেল বেলা।
হাতে হাতে বন্ধুরা সব
দিচ্ছে মেলার ডাক,
হই হই করে বলবো আমরা—
'এসো হে বৈশাখ'।

**উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়**

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

*ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।*

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

## যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

## নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

# মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

## কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

**DRS INVESTMENT** 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

# আজাদ হিন্দ সরকার গঠন এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে শেষ মোক্ষম লড়াই

**প্রণব দত্ত মজুমদার**

১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর, ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় ১০০০ জন প্রতিনিধি সিঙ্গাপুরে জমায়েত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে 'অস্থায়ী স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকার' গঠন করা হবে; এবং তাঁরা এই সিদ্ধান্তও নিলেন যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুই হবেন সেই সরকারের প্রধান। অস্থায়ী স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকারের গঠন ও কার্যপ্রণালী কীরকম হবে তা ব্যাখ্যা করে নেতাজী সেখানে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তার অল্প কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো, ''—With the creation of the National Army it became possible as well as necessary to set up a Provisional Government of Azad Hind (Free India). The Goverment is born out of the Independence League for the purpose of Launching and directing the final struggle for India's freedom. —the Provisional Government of Azad Hind will not be like a normal peace-time government. Its functions and its composition will be of unique kind. It will be a fighting organization, the main object of which will be to launch and to conduct the last war against the British and their allies in India. —The Cabinet will consist of certain number who will represent the civil departments of the Government, while there will be others representing the armed forces of the Government. Since the purpose of the Government is to fight for independence, the armed forces have been given a larger representation in the Cabinet. —When the Provisional Government is transferred to Indian soil, it will assume the functions of a normal government operating its own territory. Many new departments will then be formed."

অস্থায়ী স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকারের দপ্তর বণ্টন ছিল এরকম— রাসবিহারী বসু হলেন অস্থায়ী স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। অস্থায়ী স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকারের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডারও তিনিই নির্বাচিত হলেন। যুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী এবং বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্বও নেতাজীকেই দেওয়া হয়েছিল। লেফটেন্যান্ট এসি চ্যাটার্জি পেলেন অর্থদপ্তর। মি. এসএ আয়ার— প্রচারমন্ত্রক। ক্যাপ্টেন মিসেস লক্ষ্মী স্বামীনাথন— রানি ঝাঁসি রেজিমেন্টের দায়িত্ব পেলেন।

তাছাড়া ৮ জন সামরিক অফিসার মন্ত্রী সভায় আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিনিধি রূপে থাকলেন। তাঁরা হলেন— লেফটেন্যান্ট কর্নেল আজিজ আহমেদ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল এনএস ভগত, লেফটেন্যান্ট কর্নেল গুলজারা সিংহ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম জেড কিয়ানি, লেফটেন্যান্ট কর্নেল এডি লোগানাথন, লেফটেন্যান্ট কর্নেল এসহান কাদের, লেফটেন্যান্ট কর্নেল শাহ নওয়াজ খান, কর্নেল জে কে ভোঁসলে।

আরও ৬ জন উপদেষ্টা হিসেবে থাকলেন। তাঁরা হলেন— করিম গনি, দেবনাথ দাস, ডিএম খান, এ ইয়ালপ্পা, জে থাইভি, সর্দার ইশর সিংহ। এএন সরকার হলেন আইনি পরামর্শ দাতা এবং আনন্দ মোহন সহায় হলেন— সচিব (মন্ত্রীর পদমর্যাদা থাকবে তাঁর)। ভাবগম্ভীর পরিবেশে নেতাজী এবং অন্যান্যরা যখন শপথবাক্য পাঠ করলেন তখন আবেগে ও উত্তেজনায় সভাঘরটি যেন ফেটে পড়েছিল।

আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের পরে কালবিলম্ব না করে জাপান সরকার তাকে স্বীকৃতি দিয়ে দিল। জার্মানি সরকারও আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকৃতি দিতে দেরি করল না। কয়েক দিনের মধ্যেই আরও যে সব দেশ আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল তারা হলো— রাশিয়া, ইমন ডি ভ্যালেরার নেতৃত্বাধীন আয়ারল্যান্ড, ইতালি, বার্মা, থাইল্যান্ড, জাতীয়তাবাদী চীন, ফিলিপিন্স, ক্রোয়েশিয়া ও মাঞ্চুরিয়া। ওই দেশগুলিতে স্থাপিত হয়েছিল আজাদ হিন্দ সরকারের দূতাবাস। নেতাজীর ছবি সমেত ছাপা হয়েছিল আজাদ হিন্দ সরকারের কারেন্সি। আজাদ হিন্দ সরকারের পতাকাও তৈরি হয়েছিল। ভারতের জাতীয় পতাকার মতোই ত্রিবর্ণরঞ্জিত শুধু মধ্যবর্তী সাদা অংশে উল্লম্ফমান বাঘের চিত্র ছিল তাতে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখলে বলতে হবে— 'আজাদ হিন্দ সরকার'ই হলো অখণ্ড ভারতের প্রথম স্বাধীন সরকার। আর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী। সুতরাং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে রাসবিহারী বসু এবং সুভাষচন্দ্র বসুর যে কী অপরিসীম গুরুত্ব তাতে কি কোনো সন্দেহ রয়েছে? ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবরের যে মাহাত্ম্য তা কি এই দিনটিকে দেওয়া হয়েছে?

আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করার পরের দিনই, সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী তথা সেই সরকারের যুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী তথা আজাদ হিন্দ বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ইংল্যান্ড ও আমেরিকার সম্মিলিত বাহিনী তথা সম্পূর্ণ মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। দু'দিন পরেই নেতাজী রানি ঝাঁসি বাহিনীর ট্রেনিং ক্যাম্প আনুষ্ঠানিকভাবে

ফঃ ৬

চালু করলেন। মেয়েরাও যে যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে মিলিয়ে লড়াই করতে পারে তা বাস্তবে করে দেখালেন নেতাজী। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তিনি ১৪-১৫ বছরের ছেলেদের নিয়ে তৈরি করেছিলেন বাল সেনা। এ রকম ৫০ জন বালককে সামরিক শিক্ষার জন্য জাপানের বিশ্ববিখ্যাত রয়্যাল মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে পাঠিয়েছিলেন তিনি।

১৯৪৩ সালের ৫ ও ৬ নভেম্বর জাপানের প্রধানমন্ত্রী টোকিয়োতে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত এশীয় দেশগুলির নেতৃবৃন্দের একটি সম্মেলনের (Greater East Asia Conference) আয়োজন করেছিলেন। নেতাজী ওই সম্মেলনে জোরালো বক্তব্য রাখেন। সেখানে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ যা জাপানি সৈন্যরা ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশদের কাছ থেকে দখল করে নিয়েছিল তা আজাদ হিন্দ সরকারকে হস্তান্তরিত করা হবে এবং আজাদ হিন্দ সরকারই স্বাধীন দেশ হিসেবে ওই দ্বীপগুলির শাসনভার গ্রহণ করবে।

১৯৪৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর নেতাজী স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকারের রাষ্ট্রপতি হিসেবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকারের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি ৩০ ডিসেম্বর পোর্ট ব্লেয়ারের জিমখানা ময়দানে স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকারের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং এক বিরাট জনসভায় ভাষণ প্রদান করেন। তিনি ঘোষণা করেন আন্দামানের নতুন নাম হবে— 'শহীদ দ্বীপ' এবং নিকোবরের নতুন নাম হবে— 'স্বরাজ দ্বীপ'। আন্দামান থেকে ফিরেই নতুন বছরের প্রথমে নেতাজী আজাদ হিন্দ সরকার এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সদর দপ্তর রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করেন।

১৯৪৩ সালের শেষ দিকেই উত্তর বার্মার চিন্দউইন নদীর দু'পাশে দু'পক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। পশ্চিমদিকে ইংরেজ ও আমেরিকার যৌথ বাহিনী এবং পূর্ব দিকে জাপানি বাহিনী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাপানি বাহিনী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ আরাকান অঞ্চলে প্রথম আক্রমণ করে। 'মাউ' পর্বতমালার ভেতর দিয়ে অত্যন্ত কঠিন পথে চট্টগ্রামের উপকূল লক্ষ্য করে যৌথ বাহিনী ইংরেজ বাহিনীকে হটিয়ে দিতে দিতে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনাপতি কর্নেল মিশ্র মাইকের সাহায্যে প্রচার চালিয়ে ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর সৈন্যদের একটা বড়ো অংশকে নিজেদের দলে টেনে আনতে সমর্থ হন। এটাই আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম যুদ্ধ অভিযান এবং এতে আজাদ হিন্দ বাহিনীর যুদ্ধ সাফল্য ও পরাক্রম দেখে জাপানি বাহিনী খুবই খুশি হয়েছিল। আরাকানে এই আক্রমণ করা হয়েছিল শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করার জন্য। আসলে ইম্ফল ও কোহিমার দিকে বড়ো আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল। আরাকান অঞ্চলে আক্রমণ করে ইংরেজদের একটা বড়ো বাহিনী এবং বিমান বহরকে আটকে রাখতে পারলে ভালো সুবিধা পাওয়া যাবে— এটাই ছিল রণকৌশল।

১৯৪৪ সালের মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে জাপানি বাহিনী এবং আজাদ হিন্দ বাহিনী যুগ্মভাবে ইম্ফলের (মণিপুর) দিকে তাদের ঐতিহাসিক, দুঃসাহসিক ও অত্যন্ত কঠিন অভিযান আরম্ভ করে। তাদের কাছে ছিল না পর্যাপ্ত পরিমাণে সামরিক যানবাহন। পাহাড়- পর্বত, নদীনালা, ঝোপ জঙ্গল পায়ে হেঁটে দুরন্ত গতিতে চললেন তাঁরা। আরাকান পর্বতমালার প্রায় ২০০ কিলোমিটার তাঁরা দু-সপ্তাহে অতিক্রম করেছিলেন। ব্রিটিশ বাহিনী প্রথম দিকে একরকম হতচকিত হয়ে গেছিল। জাপানি সেনা ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনা চিন্দউইন নদী পার হয়ে তিন দিক থেকে দুর্গম পাহাড় কোহিমার দিকে দ্রুত গতিতে এগুতে থাকে এবং মার্চের শেষে তাঁরা ইম্ফলে ঢুকে পড়ে। ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে রক্তক্ষয়ী লড়াই করে তাদের হটিয়ে দিতে দিতে কর্নেল শওকত আলি মালিকের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনী এবং ক্যাপ্টেন ইতোর জাপানি বাহিনী ১৪ এপ্রিল নাগাদ ইম্ফলের (মণিপুর) মৈরাং দখল করে নেয় এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীর কর্নেল শওকত আলি মালিক আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিজয় পতাকা উড়িয়ে দেন মৈরাঙে। জাপান সরকারের সঙ্গে আজাদ হিন্দ সরকারের চুক্তি মতো এই অঞ্চল আজাদ হিন্দ সরকারের শাসনের অধিকারে এসে গেল। ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে লড়াই করে এই প্রথম ব্রিটিশ ভারতের কোনো অংশ আজাদ হিন্দ সরকারের অধীনে এসে গেল। পতাকা উত্তোলন করে কর্নেল মালিক এক উদাত্ত ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের প্রতিজ্ঞা হলো দিল্লি পৌঁছে লালকেল্লায় আমাদের পতাকা উত্তোলন করা। এই পর্যন্ত আসতে আমাদের অনেক প্রাণ বলিদান দিতে হয়েছে, আরও অনেক প্রাণ আমাদের বলিদান করতে হবে দিল্লি পৌঁছনোর জন্য।' নেতাজী ভারতের যে অংশগুলো মুক্ত হয়ে আজাদ হিন্দ সরকারের অধীনে এসে যাবে তার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল এসি চ্যাটার্জিকে।

নেতাজী একটি বিবৃতি জারি করে এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে ভারতবাসীদের কাছে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন ভারতবাসীরা যেন আজাদ হিন্দ সরকারকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন এবং ব্রিটিশ সরকারকে সবরকম ভাবে অসহযোগিতা করেন। তিনি ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাদের কাছে আবেদন করেন তারা যেন দেশের স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশের আনুগত্য ছেড়ে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেন।

এপ্রিল-মে মাস জুড়ে ইম্ফলের (এখনকার মণিপুর) নানা জায়গায় ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়, বিশেষ করে ২৫ থেকে ৩০ মে Lokpaching (Red Hill)-এ ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। প্রায় হাতাহাতি যুদ্ধে উভয়পক্ষের প্রচুর হতাহত হয়। কর্নেল শওকত মালিকের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ মৈরাংকে প্রধান ঘাঁটি করে পুরো এলাকাটা প্রায় চার মাস ধরে নিজেদের দখলে রেখেছিলেন।

ইংরেজ ও আমেরিকান বাহিনী প্রথম দিকে বেকায়দায় পড়ে গেলেও তারা তাদের শক্তিশালী বিমানবহরের সাহায্যে প্রচুর সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের সম্ভার উত্তরপূর্বের যুদ্ধক্ষেত্রে এনে ফেলেছিল। অন্যদিকে জাপানি নৌ ও বিমানবহর প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে বড়োরকমের ধাক্কা খাওয়ার ফলে ভারত-বার্মা সীমান্তে তাদের ছোটো বিমান বাহিনী ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর যুগ্ম অগ্রগতিতে রুখে দিতে সমর্থ হয়।

একইভাবে কোহিমার দিকেও জাপানি বাহিনী এবং আজাদ হিন্দ বাহিনী প্রথম দিকে বেশ দ্রুততার সঙ্গে সাফল্য পেয়েছিল। নেতাজী তখন ওখানকার Ruzazho গ্রামে (এখনকার Phek district,

Nagaland) গিয়ে কয়েকদিন থেকে ওখানকার সামরিক কার্যকলাপ তদারকি করেছেন এবং তাঁদের উৎসাহিত করেছেন। দুর্ভাগ্যবশত কোহিমাতেও আজাদ হিন্দ বাহিনী এবং জাপানি বাহিনীর গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। এই ফ্রন্টেও উভয় পক্ষের প্রচুর হতাহত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ইতিহাসে ইম্ফল ও কোহিমার লড়াইয়ের মতো এত রক্তক্ষয়ী ও কঠিন সংগ্রামের মুখোমুখি মিত্রপক্ষকে আর কোনো ফ্রন্টে পড়তে হয়নি। ঘন জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, নদী নালার মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে জাপানি সৈন্য ও আজাদ হিন্দ বাহিনীকে এগুতে হয়েছিল। ১৯৪৪ সালের এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত ইম্ফল ও কোহিমা আজাদ হিন্দ সরকারের অধীনে ছিল। জুনের শেষ থেকেই যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন হতে শুরু করে। জাপানি ও আজাদ হিন্দ ফৌজ পিছু হটতে শুরু করে। আসলে সেবার বর্ষা আগে এসে গিয়েছিল। উত্তরপূর্বের এদিকটায় পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। আরম্ভ হয়ে গেল প্রাকৃতিক দুর্যোগ। জল-কাদা পরিপূর্ণ পার্বত্য রাস্তায় খাদ্য, ওষুধ, সামরিক সরঞ্জাম প্রভৃতি প্রায় বন্ধের মুখে। পরিখা জলমগ্ন। সৈন্যরা জল-কাদায় আটকে পড়ল। তাঁরা কলেরা, ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া ইত্যাদি কঠিন অসুখে পড়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে লাগল। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপান বড়ো রকমের ধাক্কা খাওয়ায় ওদিকে তাদের পুরো শক্তি নিয়োজিত করেছিল, এদিকে বড়ো বিমান বহর বা অধিক সামরিক সরঞ্জাম পাঠাতে পারল না। অন্যদিকে ব্রিটিশ ও আমেরিকান বাহিনীর এসব জিনিসের কোনো অভাব ছিল না। তারা অধিকতর শক্তিতে প্রচণ্ড আক্রমণ করল। বড়ো বিমান বহর নিয়ে অনবরত বোমা বর্ষণ করতে লাগলো। অবশেষে নিরুপায় হয়ে জাপানি বাহিনীর অধিনায়ক কাওয়াবে পিছু হটার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং কাওয়াবে নেতাজীকে বিনয়ের সঙ্গে যুক্তি দেখিয়ে বোঝালেন কেন তাঁর এই সিদ্ধান্ত।

কিন্তু নেতাজী বললেন, স্বাধীনতার সৈনিক কখনো হার মানতে জানে না, কাজেই তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ পিছু হটবে না। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকরা যুদ্ধে হারবে জেনেও তাঁদের যুদ্ধ জারি রেখেছিল; এমনকী ১৯৪৫-এর এপ্রিলের প্রথম দিকে 'মাউন্ট পোপা'তে তাঁরা প্রতিকূল অবস্থাতেও ভীষণ সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। অবশেষে যুদ্ধের পরিস্থিতি বিচার করে নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজকে ফিরে আসার হুকুম দিলেন। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে মিত্র বাহিনীর হাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন সেনানায়ক— প্রেমকুমার সেহগল, শাহ নওয়াজ খান ও গুরুবক্স সিংহ ধিলোঁ গ্রেপ্তার হলেন।

ইতিমধ্যে ১৯৪৫ সালের ২১ জানুয়ারি মাত্র ৫৮ বছর বয়সে আজাদ হিন্দ সরকারের মুখ্য উপদেষ্টা মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসু টোকিয়োতে তাঁর নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। সমগ্র জাপান এই মনীষীর মহাপ্রয়াণে শোক দিবস পালন করে। ইতিপর্বে জাপান সরকার তাঁকে তাঁদের দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার —'Order of the Rising Sun'-এ সম্মানিত করেছিল। রাজকীয় সম্মানে তাঁর মরদেহ ইয়োজোজি মন্দিরে নিয়ে গিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। টোকিয়োতে তাঁর সমাধিস্তূপ স্থাপিত হয়েছে। ২৫ জানুয়ারি আজাদ হিন্দ সরকারের সদর দপ্তরে সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে মন্ত্রীপরিষদের সদস্য ও উপদেষ্টামণ্ডলীর উপস্থিতিতে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। ওই স্মরণসভায় যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তার কিয়দংশ তুলে দেওয়া হলো— 'প্রয়াত বসুর অবিস্মরণীয় স্মৃতির যথোপযুক্ত মর্যাদা দানের জন্য এই সভাস্থ ব্যক্তিরা পুনরায় শপথ গ্রহণ করিতেছে যে ভারতের মুক্তির জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম পরিচালিত করা হইবে স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত এবং এই ভাবেই রাসবিহারী বসুর জীবনের লক্ষ্যকে সার্থক করা হইবে।'

জাপান যখন যুদ্ধে হার মেনেই নিয়েছিল, সেই সময় ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ আগস্ট আমেরিকা একরকম অনৈতিক ভাবে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে অ্যাটমবোমা ফেলে ওই শহর দু'টিকে ধ্বংস করে দিল। এই ঘটনায় সমস্ত পৃথিবী স্তম্ভিত হয়ে গেল। পৃথিবীর বুকে পরমাণু শক্তির এইরকম অমানবিক প্রয়োগ এবং তার ধ্বংসলীলা বিশ্ববাসীর কল্পনার বাইরে ছিল।

নেতাজী বিভিন্ন জায়গায় যেসব উচ্চপদস্থ সহকর্মী ও সামরিক অফিসাররা রয়েছেন তাঁদের দ্রুত সিঙ্গাপুরে আসতে বললেন। আলাপ আলোচনা করে ঠিক হলো নেতাজী ইংরেজদের হাতে ধরা না দিয়ে অন্য কোনো গোপন স্থানে চলে যাবেন। তিনি নির্দেশ দিলেন যে তিনি চলে যাবার পর মহম্মদ জামাল কিয়ানী সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ সরকারের মুখ্য প্রতিনিধি হবেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের বা অন্য যেসব বেতনভুক কর্মচারী ছিলেন তাদের ছয়মাস কাজ চালাবার মতো টাকাপয়সার ব্যবস্থা করলেন। ইংরেজদের হাতে রানি ঝাঁসি বাহিনীর মেয়েদের যাতে কোনো লাঞ্ছনা না হয় তাই তাঁদের নিজ নিজ বাড়িতে নিরাপদে পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। জুলাই মাসের প্রথমেই সিঙ্গাপুরের সমুদ্রের তীরে আজাদ হিন্দ ফৌজের হুতাত্মাদের স্মরণে একটি স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন নেতাজী। ইংরেজ ফৌজের সিঙ্গাপুরে পৌঁছোবার আগেই যাতে স্মৃতিস্তম্ভটি তৈরি হয়ে যায় তার নির্দেশ দিলেন তিনি। তিন সপ্তাহেই অবশ্য সেটি তৈরি হয়েছিল; কিন্তু ইংরেজের ফৌজ সিঙ্গাপুর পৌঁছে ডিনামাইট দিয়ে সেই স্মৃতি স্তম্ভটিকে ধ্বংস করে ফেলে। আজাদ হিন্দ সরকার বা তার বাহিনীর কোনো কৃতিত্বের স্মারক তারা ভারতের মাটিতে রাখতে চায়নি।

নেতাজী জাপানি উচ্চ পদস্থ অফিসারদের কাছে তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন যে তিনি মাঞ্চুরিয়া হয়ে রাশিয়াতে যেতে চান। রাশিয়ান ফৌজ জাপানিদের কাছ থেকে ততদিনে প্রায় সমগ্র মাঞ্চুরিয়া দখল করে নিয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনায় অনুপ্রাণিত সুভাষচন্দ্র সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার প্রতি ইতিবাচক ধারণা পোষণ করতেন। তিনি মনে করেছিলেন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে যদিও কৌশলগত কারণে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন ও আমেরিকার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে তবুও যুদ্ধের পরে রাশিয়ার অবস্থান একই থাকবে না। তখন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের কবল থেকে স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামে ভারতের পাশে নিশ্চয়ই সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া থাকবে। কাজেই আপাতত রাশিয়াই হবে তাঁর পক্ষে সঠিক স্থান। তারপর সঠিক সময়ে আবার নতুন করে লড়াই সংগঠিত করা যাবে। এরকমটাই ভাবলেন তিনি। তিনি জাপানি সমর কর্তাদের কাছে রাশিয়া-অধিকৃত মাঞ্চুরিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য অনুরোধ করেন। টোকিয়োর উপর মহল থেকে প্রথমে আপত্তি থাকলেও পরে তাঁরা নেতাজীর প্রস্তাব মেনে নেন। ফিল্ড মার্শাল তেরাউচি জাপানি কর্মকর্তাদের নেতাজীকে মাঞ্চুরিয়া যাওয়ার জন্য

বিমানের ব্যবস্থা করে দেবার নির্দেশ দেন।

আবারও অজানার উদ্দেশে পাড়ি জমাবার পরিকল্পনা করলেন নেতাজী। ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট জাপান আত্মসমর্পণ করল। ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট নেতাজী হাবিবুর রহমান, এসএ আইয়ার-সহ কয়েকজন বিশ্বস্ত অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে বিমানে ব্যাংকক গেলেন; সেখান থেকে সাইগন গেলেন ১৭ আগস্ট। সাইগনে ওরকম সংকটময় পরিস্থিতিতে জাপানি অফিসাররা যে জাপানি বোমারু বিমানটির (Type-97) ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন তাতে কয়েকজন জাপানি সামরিক কর্তা যাবেন এবং তাঁদের সঙ্গে আর বড়োজোর মাত্র দুজন যেতে পারবেন এরকম জায়গা ছিল। তাঁরা নেতাজীকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন মাত্র একজন সহকর্মীকে নিয়ে বিমানে ওঠেন এবং তাঁর অন্য সহকর্মীদের পরবর্তী ব্যবস্থার জন্য অপেক্ষা করতে বলেন। পরিস্থিতি বিচার করে নেতাজী অন্য সহযোগীদের পরবর্তী ব্যবস্থার জন্য অপেক্ষা করতে বলে তাঁর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ মিস্টার হাবিবুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে ওই বিমানে ১৭ আগস্ট বিকেল ৫টার সময় সাইগন থেকে যাত্রা করলেন। বিমানটি ২ ঘণ্টা যাত্রা করার পর সাইগন ও হ্যানয়ের মধ্যবর্তী 'তুরেন' বলে একটি জাপানি এলাকায় অবতরণ করল রাত্রি যাপনের জন্য। পরদিন অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট ভোর ৫টায় আবার বিমানটি যাত্রা করে দুপুরে তাইপেই এয়ারপোর্ট পৌঁছল (এখন সেই বিমান বন্দরের নাম Taipei International Airport. Taiwan)। পরবর্তী গন্তব্যস্থল তাইপেই ও দাইরেনের মধ্যবর্তী মাঞ্চুরিয়ার একটি জায়গা। বিমানের সব যন্ত্রপাতি খুব ভালো করে পরীক্ষা করে নিয়ে বেলা ২টার সময় Type-97 বোমারু বিমানটি উড়েছিল; কিন্তু বিশ্ববাসীর কাছে যে খবর পৌছয় তা হলো— বিমানটি উড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে এবং ভীষণভাবে দগ্ধ হয়ে নেতাজী, জেনারেল শিদেই, দু'জন পাইলট এবং সঙ্গের দুজন বিমানকর্মী মারা যান। হাবিবুর রহমান, Nonogaki, Kono এবং অন্য পাঁচজন জাপানি অফিসার আহত হন কিন্তু তাঁরা বেঁচে যান। বলা হয় যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণে এই দুর্ঘটনার পরিপূর্ণ তদন্ত করা সম্ভব হয়নি। অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা জাপানিদের সঙ্গে যোগসাজশ করে এইরকম একটি গল্প ছড়িয়ে দিয়ে নেতাজী আবার অন্তর্ধান করেছিলেন।

নেতাজীর মৃত্যু নিয়ে ভারতবাসীর মনে অনেক সন্দেহ দেখা দেয়; এ পর্যন্ত ভারত সরকার তিন তিনটি তদন্ত কমিশন বসিয়েছে। তাঁরা কেউই নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্ক নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি; নেতাজীর মৃত্যুরহস্য নিয়ে আজও গবেষণা চলছে।

নেতাজী তাঁর গোপন গন্তব্যে যাত্রা করার আগে আজাদ হিন্দ বাহিনীর বীর সৈনিক এবং পূর্ব-এশিয়ার সমস্ত স্বাধীনতাকামী মানুষের উদ্দেশে এক বিশেষবার্তা রেখে গিয়েছিলেন যেটা বাংলা করলে দাঁড়ায়— 'প্রিয় বোন ও ভাইয়েরা। আমাদের ইতিহাসের এই অভূতপূর্ব সঙ্কটময় মুহূর্তে আমি একটি কথাই বলবো যে, আমাদের এই সাময়িক হারের জন্য একদম হতাশ হবেন না। নিজেকে প্রফুল্ল ও সতেজ রাখুন। সর্বোপরি, এক মুহূর্তের জন্যও ভারতের ভাগ্য সম্পর্কে হতাশ হবেন না বিশ্বাস হারাবেন না। পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যা ভারতবর্ষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখতে পারে। ভারতবর্ষ খুব শীঘ্রই স্বাধীন হবে।'

তিনি যেন মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছিলেন ভারতের ভবিষ্যৎ। তাঁর এই বার্তার দু'বছরের মাথায় ভারত স্বাধীন হয়েছিল। ইংরেজ সরকার যখন আজাদ হিন্দ বাহিনীর বীর সৈনিকদের যুদ্ধবন্দি হিসেবে বিচার আরম্ভ করে তখন ভারতীয় সৈন্যবাহিনী-সহ ভারতবর্ষ জুড়ে যে মহাবিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল তার ফলেই ব্রিটিশ সরকার ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। সে অন্য এক ইতিহাস।

আমরা মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসু এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছি কি? আর এক মহান বিপ্লবী বীর সাভারকর এই দুই মনীষী সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন— ''পূর্ব এশিয়ায় রাসবিহারী যে মুক্তি সৈন্যবাহিনী গঠন করেন, আজন্ম-অধিনায়ক সুভাষ 'নেতাজী' নাম গ্রহণ করিয়া সেই সৈন্যবাহিনী লইয়াই গ্যারিবল্ডির মতো রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হন। জগদ্‌বিখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারীর অনন্যসাধারণ মনশক্তি, শক্তিশালী লেখনী, অপূর্ব সংগঠন শক্তি পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় মুক্তি সঙ্ঘ (ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ) গঠন করিতে সমর্থ হয়। ভারতের মুক্তিযুদ্ধে রাসবিহারীর অবদান অপরিসীম। যাহারা বলেন ১৯৪২-এর আন্দোলনের ফলে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে তাঁহারা হাস্যকর কথাই আবৃত্তি করেন। ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ সেই দিন হইতে সাফল্যের পথে অগ্রসর হইয়াছে, যেদিন রাসবিহারী বসু ও নেতাজী ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে দেশপ্রেমের বীজ রোপণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। রাসবিহারী অক্লান্ত পরিশ্রমে যে আইএনএ গঠন করিয়াছিলেন, নেতাজী তাহারই নেতৃত্ব দিয়াছেন।"

মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসু তাঁর তৈরি আজাদ হিন্দ বাহিনীর দায়িত্ব তাঁর প্রিয় সুভাষের নেতৃত্বে অর্পণ করে তাঁর ডায়েরির নোটে লিখেছিলেন, 'I am a fighter. One fight more, the last and the best.' ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে প্রকৃত অর্থেই এটা ছিল শেষ মোক্ষম লড়াই। রাসবিহারী বসু তাঁর কথিত শেষ মোক্ষম লড়াইয়ের ফল দেখে যেতে পারেননি ঠিকই কিন্তু আপামর ভারতবাসী তাঁর ফল— স্বাধীনতা ভোগ করছি।

**তথ্যসূত্র :**

১. কর্মবীর রাসবিহারী— অধ্যাপক বিজনবিহারী বসু।

২. বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু— মনোরঞ্জন ঘোষ।

৩. স্বাধীনতার যুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজ—শিশিরকুমার বসু।

৪. A Beacon Across Asia— S.K. Bose, A. Werth, S.A. Ayer.

৫. Bose An Indian Samurai-Maj Gen (Dr.) GD Bakshi, VSM (retd).

৬. Bose or Gandhi Who Got India Her Freedom— Maj Gen (Dr.) GD Bakshi, VSM (retd.)

৭. Revolutionaries— by Sanjeev Sanyal.

# হিন্দুস্থানে হিন্দুরাই সংখ্যালঘু হওয়ার পথে

**অজয় ভট্টাচার্য**

অবৈধ অনুপ্রবেশ পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস পালটে তো দিচ্ছেই, পাশাপাশি স্থানীয় সংস্কৃতি ও সামাজিক ভারসাম্যেও প্রভাব ফেলছে। মনোযোগ দিয়ে একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে আমাদের চারপাশটা কেমন যেন একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে। স্থানীয় সংস্কৃতি বদলে যাচ্ছে। ভাষা বদলে যাচ্ছে। ভাষার ধরন বদলে যাচ্ছে। কথা বলার আদব-কায়দা বদলে যাচ্ছে। সমাজের রীতিনীতি, নম্রতা, বিনয়— সেসবও বদলে যাচ্ছে। বেঁচে থাকার জন্য অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শিষ্টাচারও ধীরে ধীরে উধাও হয়ে যাচ্ছে। কারণ অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে কুশিক্ষা, অপশিক্ষা ও অপপ্রথারও অনুপ্রবেশ ঘটছে। সামাজিক সমন্বয় ভেঙে পড়ছে। ফলে সামাজিক ভারসাম্যও ভেঙে পড়ছে। সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান বাড়ছে। বেআইনি কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 'অবৈধ' মাদ্রাসা বাড়ছে। 'অবৈধ' মসজিদ গড়ে উঠছে। এতদিন যেখানে আজানের শব্দ পৌঁছাতে পারত না, সেখানেও আজানের শব্দ পৌঁছে যাচ্ছে। অজানা অচেনা মানুষজনের আনাগোনা বাড়ছে। নাগরিক শনাক্তকরণে জটিলতা বাড়ার সুযোগ নিয়ে জঙ্গি অনুপ্রবেশ ঘটছে। আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে। অপরাধ ও অপরাধীতে ভরে উঠছে চারপাশ। ২০১৪ সালে খাগড়াগড়ের বিস্ফোরণ রাজ্যে জঙ্গি কার্যক্রমের বড়োসড়ো প্রমাণ দিয়েছিল। নিউটাউনের হাতিয়াড়া এলাকায় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির আড়ালে জঙ্গি কার্যকলাপ চলত বলে অভিযোগ উঠেছিল। সেখান থেকে উমর ফারুক ও রবিউল ইসলাম নামে দুজন জঙ্গি সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়েছিল। এছাড়াও মালদার মোথাবাড়িতে বিচারকদের আটকে রাখা ও হিংসার পেছনে জেহাদি সংগঠনের যোগসূত্র থাকতে পারার সম্ভাবনা প্রবলভাবে উঠে এসেছে। এনআইএ তদন্তের আওতায় সেটাও আছে।

অবৈধ অনুপ্রবেশ চলতে থাকায় অর্থনৈতিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে রাজ্যবাসী। শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ছে। অদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। স্বল্প বেতনে কম দক্ষ শ্রমিক বাজারে সহজলভ্য হয়ে পড়ছে। যার ফলে কাজের বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক কাজ পাচ্ছে না, অথবা কাজ অনুযায়ী মজুরি মিলছে না। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা স্বল্প বেতনে কাজের বাজার দখল নিয়ে নিচ্ছে। ফলে এদেশীয়রা কাজ হারাচ্ছে। ধীরে ধীরে ব্যবসা বাণিজ্যও চলে যাচ্ছে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের হাতে। মোড়ে মোড়ে হাজি বিরিয়ানি, আফরিন বিরিয়ানির দোকান গজিয়ে উঠছে। লাভ জেহাদ, ল্যান্ড জেহাদ, বাণিজ্য জেহাদ, ব্যাপারি জেহাদ— সবই বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অংশবিশেষ, যা অনুপ্রবেশকারীদের দৌরাত্ম্যে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। ল্যান্ড জেহাদের পরিণামে বাস্তু জমি-সহ কৃষি জমির অপ্রতুলতা দেখা দিচ্ছে।

আগে যেখানে কৃষিকাজ হতো এখন সেখানে নতুন নতুন বসতি গড়ে উঠছে। মাঠের পর মাঠ দখল হয়ে যাচ্ছে অনুপ্রবেশকারী মানুষজনের ভিড়ে। ফলে কৃষি জমির সংকট দেখা দিচ্ছে। অথচ কৃষি আমাদের ভিত্তি। ভারতের জিডিপি-র ১৮ শতাংশ কৃষিক্ষেত্র থেকে আসে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, দেশের প্রায় ৪৬ শতাংশ কর্মশক্তি সরাসরি কৃষিখাতে নিয়েজিত, যা গ্রামীণ অর্থনীতিতে বড়ো ভূমিকা রাখে। ভারতের গ্রামীণ পরিবারগুলোর প্রায় ৫৭ শতাংশ কৃষি কাজের ওপর নির্ভরশীল। তাই কৃষক কৃষিজমি হারিয়ে ফেললে সে যাবে কোথায়? হয় তাঁকে পরিযায়ী শ্রমিক হতে হবে, নাহলে শহরে দিনমজুরের কাজ করতে হবে। সর্বোপরি, কৃষিজমি না বাঁচালে খাদ্য নিরাপত্তা সংকটাপন্ন হবে। তাই অনুপ্রবেশকারী বাড়ার ফলশ্রুতিতে খাদ্য নিরাপত্তাও সংকটাপন্ন হবে।

অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে ভয়ে ভদ্র শ্রেণীর মানুষ পালিয়ে যাচ্ছেন দূরে— অন্য গ্রামে বা অন্য শহরে। কিন্তু পালিয়ে তিনি যাবেন কোথায়? এরকম চলতে থাকলে, আজ না হোক কাল, সেখানেও অনুপ্রবেশকারীরা ভিড় করবে। জমি, জায়গা দখল করে নেবে। দেশের সম্পদে সমানাধিকার দাবি করবে। সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণের সুবিধা নেবে। এদেশীয় চাকুরিপ্রার্থী যে চাকরিটা পেতে পারত, তা পাবে একজন মুসলমান অনুপ্রবেশকারী। কলেজের যে সিট একজন এদেশীয় তরুণ পেতে পারত, তা পাওয়ার দাবি জানাবে একজন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। ওবিসি ক্যাটাগোরির সুবিধা নিয়ে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারও বনে যেতে পারে অনুপ্রবেশকারীরা। কারণ রাজ্যের শাসক দলের আনুকূল্যে ওবিসি সার্টিফিকেট জোগাড় করা কোনো ব্যাপার নয়। মনে রাখতে হবে, মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরাই তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটব্যাংক। সরকারি সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তিতেও মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা অনেক এগিয়ে। তাদের দুধে ভাতে রাখার জন্য সরকারি প্রচেষ্টার কোনো খামতি নেই।

তাই রাজ্য বাজেটে বিজ্ঞানচর্চায় বরাদ্দ হয় মাত্র ৮২ কোটি। আর সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষাখাতে বরাদ্দ হয় ৫,৭১৩ কোটি। ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৯ শতাংশ। আজ তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ শতাংশ হয়েছে। একই সময়ে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৭৮ শতাংশ। আজ তা কমে হয়েছে ৬৮ শতাংশ। সবমিলিয়ে হিন্দুরাই আজ হিন্দুস্থানে সংখ্যালঘু হওয়ার পথে। □

# একটা ছোটো ভুল আবার বাঙ্গালিকে দেশভাগের মতো অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করবে না তো?

আজ থেকে ঠিক ৯০ বছর আগে কী ঘটেছিল এই বঙ্গভূমিতে? কোথায় ছিল বাঙ্গালি জাতি? বিষয়টি পর্যালোচনা করা হলে দেখা যাবে যে, তখন 'দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৩৫' পাশ হয়েছে এবং ভারতের প্রতিটি প্রদেশে চলছে ভোটের প্রস্তুতি। পরিতাপের বিষয় হলো, অধিকাংশ বাঙ্গালি— বামপন্থী ইতিহাসবিদদের দয়ায় জানেই না যে, স্বাধীনতার আগে তিনবার আমাদের দেশে ভোট হয়েছে এবং একমাত্র অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশে কংগ্রেস একবারও জয় লাভ করেনি। কারণ বাংলাভাষী মুসলমানরা কংগ্রেসকে হিন্দুদের দল মনে করত। অন্য রাজ্যেরও কি মুসলমানরা ছিল না? বিভিন্ন রাজ্যে তারা মুসলিম লিগকে সমর্থন করলেও দেশের অন্যান্য প্রান্তে মুসলমানদের একাংশ কিন্তু কংগ্রেসের পাশে দাঁড়ায়।

ওই সময় বঙ্গপ্রদেশে বরেণ্য কারা ছিলেন? (১) ঋষি অরবিন্দ তখন পণ্ডিচেরীতে অবস্থান করছেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামীজীর জাতীয়তাবাদী আদর্শ গোটা দেশে ছড়িয়ে দিয়ে যোগসাধনায় রত ঋষি অরবিন্দ। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলতেন যে, তিনি আশা করেন একদিন ঋষি অরবিন্দ বঙ্গভূমিতে ফিরবেন এবং দেশকে স্বাধীন করবেন। কিন্তু ঋষি প্রত্যাবর্তন না করায় নেতাজী নিজে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

(২) জেলে অত্যাচারে ভীষণ অসুস্থ হয়ে ইউরোপ যান নেতাজী। ইউরোপ থেকে চিকিৎসা করে কিছুটা সুস্থ হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন। আবার ফিরে আসেন সক্রিয় রাজনীতিতে। তিনি হন কংগ্রেস সভাপতি। কিন্তু উপরোক্ত আইন অনুযায়ী তাঁকে দেশের প্রধানমন্ত্রী করার অপেক্ষায় থাকে সারা ভারতবর্ষ। না গান্ধী, না নেহরু, না প্যাটেল, না আজাদ; দেশ তখন চায় নেতাজীকে। একমাত্র বাদ বঙ্গপ্রদেশ। কারণ এখানে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু।

(৩) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন অসুস্থ। তাঁর বয়স তখন ৭৫ বছর।

কিন্তু সারা ভারত চাইলেও, অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশে তৎকালীন সংখ্যাগুরুদের কাছে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা কতটা ছিল? উত্তর হলো শূন্য। হ্যাঁ, একেবারেই শূন্য। রাজনৈতিকভাবে ভীষণ সচেতন মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে বঙ্গীয় মনীষীদের কোনো দামই ছিল না। যার ফলস্বরূপ ১৯৩৫ সালে প্রণীত আইন অনুযায়ী ১৯৩৭-এ প্রথমবার প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে বঙ্গপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রী হন ফজলুল হক। তারপর ১৯৪২-এ খাজা নাজিমুদ্দিন এবং ১৯৪৬-এ সুরাবর্দি। ১৯০৬ সালে মুসলিম লিগ তৈরি হয় অবিভক্ত বঙ্গের ঢাকাতে— অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দলের সমান্তরাল হিসেবে এবং এই বিষাক্ত, সাম্প্রদায়িক দলটি তৈরিতে অর্থ জোগায় ব্রিটিশ সরকার। সেই যুগে সেই অর্থের পরিমাণ ছিল ১৪ লক্ষ টাকা। আর তাই মুসলিম লিগ বারবার ব্রিটিশ সরকারের সমর্থনেই কাজ করে গিয়েছে। আর তাই সমগ্র ভারতবর্ষ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঋষি অরবিন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে গ্রহণ করলেও এই মনীষীদের বাণী ও আদর্শ বর্জন করে একমাত্র অবিভক্ত বঙ্গ। কারণ বাংলাভাষী মুসলমানরা এখানে ছিল সংখ্যাগুরু। এমনকী ১৯৪৩-এ মুসলিম লিগের শাসনে বঙ্গপ্রদেশ জুড়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে ৩০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটলেও মুসলমানরা তাদের সিদ্ধান্তে ছিল অটল।

এবার বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে— বাঙ্গালিরা ভাবছে যে, পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দু অধিকারী, শমীক ভট্টাচার্য, শুভঙ্কর সরকার, অধীর চৌধুরীদের হাতে রয়েছে। কিন্তু এখানেই ভুল ভাবছে বাঙ্গালি! গত আট দশকে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা ১৮ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩০ শতাংশ। স্বাধীনতার পরে মুসলিম লিগ কেরলম্ বা ভাগ্যনগরে তাদের সংগঠন চালালেও, পশ্চিমবঙ্গে সাহস পায়নি। ১৯৪৭-এর পর বিভিন্ন পর্যায়ে মুসলমানরা কংগ্রেস, সিপিএম ও তৃণমূল কংগ্রেসে ঢুকে তাদের সাম্প্রদায়িক নীতির প্রয়োগ ঘটায়। যেমন— জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, তথাকথিত ভূমি সংস্কার, চর্মনগরী বাদে বাকি সব শিল্পের সর্বনাশ, কম্পিউটার ঢুকতে না দেওয়া, এ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সর্বনাশ। এমনভাবে এই পরিকল্পনা করা হয় এবং সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা হয় যাতে বাঙ্গালি পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে দিল্লি, মুম্বই, পুনে, ব্যাঙ্গালোর, নয়ডা, গুরুগ্রাম, লন্ডন বা নিউ ইয়র্কে চলে যায় বা চলে যেতে বাধ্য হয়। উচ্চশিক্ষা ও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সন্ধানে বাঙ্গালি দেশান্তরী হলে যাতে মুসলমানরা তাদের পুরোনো অ্যাজেন্ডা রূপায়ণ করতে পারে তথা কলকাতা দখল ধীরে ধীরে করতে পারে। তাই গত ১ এপ্রিলের আগে যে মোফাক্কারুল ইসলামকে কেউ চিনত না, আজ শোনা যাচ্ছে যে সামাজিক মাধ্যমে তার ফলোয়ার হলো— ২৪ লক্ষ!

পশ্চিমবঙ্গের একটা বড়ো অংশের কাছে এই মুহূর্তে নেতা বলতে অন্য তিন জন। ঠিক ১৯৩৬-৩৭-এর মতো। তারা হলো— (১) মোফাক্কারুল ইসলাম, (২) হুমায়ুন কবির, (৩) আব্বাস সিদ্দিকি। যদি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের ইতিহাস আগামীদিনে বামপন্থীরা ফের না লেখে, তবে আশা করা যায় যে, মোফাক্কারুল, হুমায়ুন বা আব্বাসদের আজকের বিষাক্ত রাজনীতিকে ভুলিয়ে দেওয়া হবে না ফজলুল হক, খাজা নাজিমুদ্দিন, সুরাবর্দিদের সেদিনের রাজনীতির মতো। কবি নজরুল একজন মহান সাহিত্যিক। কিন্তু তাঁর রচিত পদ্যের বিক্রেতাদের দ্বারা যা সম্ভব হয়নি, ১৯৪৭-পরবর্তী পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গে সেই কাজ করেছে নির্লজ্জভাবে জেহাদি তোষণকারী বাম-অতিবাম-কংগ্রেসি-তৃণমূলি রাজনীতিকরা। সেকুলার রাজনৈতিক দল এবং তাদের পোষ্য ইতিহাসবিদরা 'একই বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু-মুসলমান'-এর কনসেপ্ট বিক্রি করার জন্য ফের ভুল ইতিহাস না লিখলে আজকের চলমান পরিস্থিতি আগামীদিনে বাঙ্গালির সার্বিক জাগরণে অবশ্যই সহায়ক হবে। □

# আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি-র প্রার্থীদের সমর্থনের সিদ্ধান্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা-র

পশ্চিমবঙ্গকে তৃণমূল কংগ্রেসের অপশাসন-মুক্ত করতে সরাসরি বিজেপির পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা। রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের কাছে পাঠানো চিঠিতে এ রাজ্যের হিন্দু ভোট একজোট করার ডাক দিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা। এই বিধানসভা ভোটে তাঁরা বিজেপিকে নিঃশর্তভাবে সমর্থন করছেন বলে গত ৩০ মার্চ জানিয়েছেন হিন্দু মহাসভার সাংগঠনিক সম্পাদক অনন্ত সিংহরায়। খুব দ্রুত সাংবাদিক সম্মেলন করে বিজেপিকে সমর্থনের বিষয়টি তাঁরা জনসমক্ষে আনবেন বলেও তিনি জানান। গত ২০ মার্চ জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে লেখা একটি চিঠিতে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য কমিশনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক অপূর্ব মণ্ডল। এই চিঠিতেই এ রাজ্যে সন্ত্রাস ও হানাহানি-মুক্ত পরিবেশে যাতে অবাধ, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সংঘটিত হতে পারে— সেই বিষয়টি সুনিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রতি দাবিও তিনি জানিয়েছেন। গত ২৩ মার্চ তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সভাপতি শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে পাঠানো চিঠিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা নিজস্ব কোনো প্রার্থী মনোনীত না করে এ রাজ্যের সবক'টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টি-র মনোনীত প্রার্থীদের সমর্থন দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। হিন্দু মহাসভা মনে করে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের এই দুঃসময়ে পশ্চিমবঙ্গকে একমাত্র রক্ষা করতে পারে ভারতীয় জনতা পার্টি। হিন্দু মহাসভা পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী উদ্বাস্তু পরিবার, তপশিলি জাতি, উপজাতি ও সাধারণ হিন্দুত্ব চেতনাসম্পন্ন নাগরিকদের কাছে আবেদন জানাচ্ছে যে, সামগ্রিকভাবে এ রাজ্যের স্বার্থে, হিন্দুবিরোধী ও রাষ্ট্রবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির প্রার্থীদের পরাজিত করে বিজেপি প্রার্থীদের জয়যুক্ত করুন। বিজেপি প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারে হিন্দু মহাসভা বিভিন্নভাবে তাঁদের পাশে থাকতে পারে বলে জানিয়েছেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা-র সভাপতি শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সংগঠনের যুক্তি, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এ রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাজিত করার ক্ষমতা একমাত্র বিজেপিরই রয়েছে। এ রাজ্যে চূড়ান্ত অরাজকতা সৃষ্টির জন্য তৃণমূলের মতো রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি পরিচালিত সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ব্যক্ত করে হিন্দু মহাসভার দাবি, এ রাজ্যে রাজনৈতিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে হলে এই সরকারকে সরানো জরুরি। শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্বাক্ষরিত এই পত্রে উদ্বাস্তু পরিবার, তপশিলি জাতি-উপজাতি ও সাধারণ হিন্দু ভোটারদের একজোট হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, যদি এই বার্তা তৃণমূলস্তরে প্রভাব ফেলে, তবে ভোটের অঙ্কে বড়সড় পরিবর্তন আসতে পারে। শুধু সমর্থন দানেই থেমে থাকেনি হিন্দু মহাসভা। বিজেপির প্রচারে সরাসরি যোগ দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁরা। চিঠিতে জানানো হয়েছে, বিজেপি অনুমতি দিলে তারা নির্বাচনী প্রচারেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। অর্থাৎ নির্বাচনের আগে ময়দানে বিজেপির শক্তিবৃদ্ধিতে প্রস্তুত হিন্দু মহাসভা। চিঠিতে ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করে বিজেপির সঙ্গে হিন্দু মহাসভার আদর্শগত সম্পর্কের কথাও তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে একটি ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক যোগসূত্র সামনে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। এই চিঠিতে রাজনৈতিক বার্তা স্পষ্ট— 'তৃণমূল কংগ্রেস বনাম একজোট হিন্দু ভোট'। এই সমীকরণ পশ্চিমবঙ্গের ভোটযুদ্ধে ইতিবাচক প্রভাবে ফেলবে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

## ভবানীপুরে ভোলা গিরি আশ্রমে তৃণমূলি হামলা

**গত ১০ এপ্রিল দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর-স্থিত ভোলা গিরি আশ্রমে সাধুসন্তদের ওপর এ রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস-আশ্রিত গুন্ডা ও সমাজবিরোধীদের বর্বরোচিত আক্রমণ নেমে আসে। স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলরের নেতৃত্বে সংঘটিত এই হামলায় সাধুসন্তদের মারধর করা হয় এবং তাঁদের গলা কেটে নেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়। সাধুসন্তরা আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় সনাতনী হিন্দুদের কর্তব্য কী, এ রাজ্যে বর্তমানে হিন্দুরা কতটা সংকটাপন্ন ও বিপদগ্রস্ত— সেই বিষয়ে প্রচার করছিলেন। তাঁরা কোনো রাজনৈতিক দলের হয়ে প্রচার করছিলেন না। তাঁরা ধর্মপ্রচার করছিলেন। সেই সময় স্থানীয় কাউন্সিলর অসীম বসুর নেতৃত্বে তৃণমূলি গুন্ডারা সন্ন্যাসীদের ওপর আক্রমণ চালায়। সাধুসন্তরা চোর ডাকাত, তাঁরা ভবানীপুরে চুরি করতে এসেছেন— এই ধরনের অপবাদ কাউন্সিলরের শাগরেদরা এদিন সন্ন্যাসীদের ওপর দেয়। আশ্রমের কর্ণধার বিষ্ণু মহারাজকে আশ্রমের বিদ্যুৎ ও জলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার হুমকিও দেওয়া হয়। মহারাজ শাসক দলের পার্টি অফিসে গিয়ে হাজিরা না দিলে আশ্রম ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেয় গুন্ডাবাহিনী। এমতাবস্থায় সন্ত্রস্ত সাধুসন্তরা স্থানীয় থানায় ডায়েরি করতেও ভয় পাচ্ছেন বলে সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে। ভোলা গিরি আশ্রমে শাসক দলের এই জঘন্য হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ ও হিরণ্ময় গোস্বামী মহারাজ। তৃণমূলি হার্মাদ বাহিনীর সন্ত্রাস রুখে দেওয়ার লক্ষ্যে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের সনাতনী হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।**

# গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৭০)

**গান্ধীজীর সঙ্ঘ-শিবির পরিদর্শন**

১৯৩৪ সালে ওয়ার্ধার সেগাঁও (বর্তমানে সেবাগ্রাম) শেঠ যমুনালাল বাজাজের বিশাল ফাঁকা মাঠে সঙ্ঘের শীতকালীন শিবির আয়োজিত হয়েছিল। শিবির স্থানের নিকটেই ছিল গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আশ্রম। ২২ ডিসেম্বর এই শিবিরের উদ্বোধন হয়। সকাল থেকে সঙ্ঘের অনুশাসনবদ্ধ কার্যক্রম, শারীরিক, ঘোষবাদ্য-সহ সঞ্চালন সবই গান্ধীজী আশ্রমের দ্বিতল থেকে দেখতে পেতেন। এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্মযোজনা দেখে তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত ও আকৃষ্ট হলেন। তিনি মহাদেব দেশাইয়ের কাছে শিবির দর্শনের আগ্রহ প্রকাশ করেন। মহাদেব দেশাই ওয়ার্ধা জেলার সঙ্ঘচালক আপ্পাজী যোশীকে শ্রদ্ধেয় গান্ধীজী শিবির দর্শনে আগ্রহী— এই মর্মে পত্র লিখে আপ্পাজীকে সময় ঠিক করার অনুরোধ করলে অবিলম্বে আপ্পাজী শ্রদ্ধেয় গান্ধীজী সকাশে উপস্থিত হন। আপ্পাজী গান্ধীজীকে শিবির দর্শনের সুবিধাজনক সময় জানতে চাইলে মৌনব্রত থাকায় তিনি লিখে জানালেন পরদিন সকাল ৬টায় দেড় ঘণ্টার জন্য সঙ্ঘ শিবির দর্শনে তিনি যেতে পারেন। আপ্পাজী সম্মতি জানিয়ে ফিরে এলেন।

পরেরদিন সকালে ঠিক ছ'টায় শ্রীমহাদেব দেশাই, মীরাবেন-সহ গান্ধীজী শিবিরে উপস্থিত হলে সঙ্ঘপদ্ধতি অনুযায়ী ঘোষবাদ্য-সহ স্বয়ংসেবকরা তাঁদের স্বাগত জানায়। এই মুগ্ধকর স্বাগত ব্যবস্থা দেখে গান্ধীজী আপ্পাজী যোশীর কাঁধে হাত রেখে বললেন— 'আমি বাস্তবিকই আনন্দিত হয়েছি। সারা দেশে এইরূপ প্রভাবী দৃশ্য আমি আজ পর্যন্ত কোথাও দেখিনি'।

এরপর তিনি রন্ধনশালা পরিদর্শন করেন এবং আশ্চর্য হলেন জেনে যে স্বয়ংসেবকদের দেওয়া শুল্কে এবং অত্যন্ত কম পয়সায় এই ভোজন ব্যবস্থা করা হয় আর এক ঘণ্টার মধ্যে এত স্বয়ংসেবকের ভোজন পর্ব সমাধা হয়ে যায়। চিকিৎসালয়, স্বয়ংসেবকদের আবাস স্থানও তিনি নিরীক্ষণ করেন এবং খোঁজখবর নিতে গিয়ে জানলেন— এখানে কৃষক, শ্রমিক, ব্রাহ্মণ, মাহার, মারাঠা সবাই একসঙ্গে থাকে, খাওয়াদাওয়া করে। কথাবার্তার মধ্যে তাঁর প্রশ্নের উত্তরে স্বয়ংসেবকেরা জানায়— 'ব্রাহ্মণ, মারাঠি, দর্জি ইত্যাদি ভেদাভেদ আমরা সঙ্ঘের মধ্যে স্বীকার করি না। আমার পাশে কোন জাতের স্বয়ংসেবক বসে তা আমরা জানি না এবং জানার ইচ্ছাও কখনো হয় না। আমরা সবাই হিন্দু, এই কারণে আমরা সবাই ভাই'।

এই সব শুনে মহাত্মাজী সত্যি সত্যি আপ্লুত হলেন। তাঁর কাছে সব যেন অদ্ভুত মনে হলো। তিনি আপ্পাজীকে প্রশ্ন করলেন— 'আপনারা জাতিভেদের মনোভাব কেমন করে মিটিয়ে দিয়েছেন'? আপ্পাজী অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন— 'এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ডাক্তার হেডগেওয়ারের। সেই মুহূর্তে ধ্বজারোহণের ঘোষবাদ্য বেজে উঠলে গান্ধীজীও স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে 'দক্ষ' স্থিতিতে দাঁড়ান এবং সঙ্ঘ পদ্ধতিতে ধ্বজপ্রণাম করেন। বস্তু ভাণ্ডার পরিদর্শনে গিয়ে সমস্ত সামগ্রীর সঙ্গে টাঙানো একটি ছবি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করে আপ্পাজীর কাছে জানতে চান— 'ছবিটি কার'? আপ্পাজী জানালেন— তিনি পূজনীয় ডাঃ কেশবরাও হেডগেওয়ার, 'অস্পৃশ্যতা দূর করার ব্যাপারে যার কথা বলেছিলেন তিনিই তো ডাক্তার হেডগেওয়ার। সঙ্ঘের সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক'? মহাত্মাজী জানতে চাইলেন। 'তিনি সঙ্ঘের প্রধান। আমরা তাকে সরসঙ্ঘচালক বলি। —তাঁর নেতৃত্বেই সঙ্ঘের সব কাজ চলছে, তিনিই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেছেন'— আপ্পাজী উত্তরে বললেন। ডাক্তারজী তখন ওয়ার্ধার বাইরে। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করে গান্ধীজী ফিরে গেলেন আশ্রমে।

*সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস*